

# কৃষিশিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড  
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ  
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত।

---

# কৃষিশিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণী

## রচনা

ডাঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ  
ডঃ মোঃ মতিয়ার রহমান  
বেগম আনওয়ারী  
মোঃ আনোয়ার হোসেন

## সম্পাদনা

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড  
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, -ঢাকা  
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৬  
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০  
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০০৮  
পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ  
ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ  
সেলিম আহমেদ

চিত্রাঙ্কন  
এ.এফ.এম মনিরুজ্জামান শিপু  
মাতিয়া বানু শুকু  
রুহুল আমিন বজলু

ডিজাইন  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

---

মুদ্রণ :

## প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের বিভিন্ন সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

বাংলাদেশে অর্থনীতি ও উন্নয়নকর্ম মূলত কৃষিভিত্তিক। তাই, কৃষি উন্নয়নের মূল হাতিয়ার স্বরূপ কৃষিশিক্ষা গ্রহণ ও দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে কৃষি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে কৃষির প্রয়োগযোগ্য প্রযুক্তিসমূহের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক উভয়দিকেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। সেদিক বিবেচনা করে এই পুস্তকে কৃষিশিক্ষা, উদ্যান ফসল, বনায়ন, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশুপাখি পালনের প্রয়োগিক প্রযুক্তিসমূহ সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর স্বকর্মসংস্থান, শ্রম ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশের জন্য ব্যবহারিক কাজের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ১৯৯৪ সাল থেকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে কৃষিশিক্ষাকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর কৃষিশিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণীর ৬০টি পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করে সময়মতো পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

ঢাকা।

## সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	কৃষিশিক্ষা	
	প্রথম পরিচ্ছেদ-কৃষি ও কৃষিশিক্ষা	১
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-কৃষি ও মাটি	৩
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ-উদ্ভিদের পুষ্টি ও সার	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	শাকসবজি উৎপাদন	
	প্রথম পরিচ্ছেদ - শাকসবজির পরিচিতি	১০
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - শাকসবজি উৎপাদন পদ্ধতি	১৪
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ - কয়েকটি শাকসবজির চাষ	১৯
তৃতীয় অধ্যায়	বনায়ন	
	প্রথম পরিচ্ছেদ - বনের পরিচিতি	৩০
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - নার্সারিতে চারা তৈরি	৩৪
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বৃক্ষের চারা রোপণ ও যত্ন	৪১
চতুর্থ অধ্যায়	মাছ চাষ	
	প্রথম পরিচ্ছেদ - মাছ	৪৪
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - পুকুর	৫১
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ- মাছ চাষে করণীয় কাজ	৫৫
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ - নাইলোটিকা মাছ	৬২
পঞ্চম অধ্যায়	গৃহপালিত পাখি পালন	
	প্রথম পরিচ্ছেদ - গৃহপালিত পাখির পরিচিতি	৬৬
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - গৃহপালিত পাখির খাদ্য	৭১
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ - হাঁস-মুরগির রোগ	৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	গৃহপালিত পশু পালন	
	প্রথম পরিচ্ছেদ - গৃহপালিত পশুর পরিচিতি	৭৬
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব	৮২
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ - গবাদি পশুর খাদ্য	৮৫
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ - গবাদি পশুর রোগ ও করণীয়	৮৯

# প্রথম অধ্যায়

## কৃষিশিক্ষা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### কৃষি ও কৃষিশিক্ষা

ফসল, পশুপাখি, মাছ ও বন চাষ করতে মাটির জৈবিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাকে কৃষি বলা হয়। মাটিতে চারা উৎপাদন, বন, ফুল, ফল ও শাকসবজির বাগান তৈরি, মাছের চাষ, গৃহপালিত পশুপাখি পালন, ঘাস ও খাদ্য উৎপাদন এবং ফসল উৎপাদন মাটির জৈবিক ব্যবহারের মধ্যে পড়ে। জমি চাষ, সার ব্যবহার, ফসল ও পশুপাখির পরিচর্যা উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়ে।

কৃষি কাজ মানুষের সবচেয়ে পুরাতন পেশা। অবিরাম পরিবর্তনে এই পেশার অনেক উন্নয়ন হয়েছে ও হচ্ছে।

### কৃষির গুরুত্ব

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এই দেশের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভর করে। কৃষি উৎপাদিত পণ্য, যেমন : চা, পাট, শাকসবজি, মাছ ও চামড়া রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়। দেশের বেশির ভাগ শিল্প কারখানার কাঁচামাল কৃষি হতে আসে। বিশ্বের উন্নত দেশ যথা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ শিল্পে উন্নত হওয়ার আগে কৃষির উন্নতি সাধন করেছিল। বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থা এখনও অনুন্নত। তাই শিল্প কারখানা উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উন্নয়নের ওপর জোর দিতে হবে।

নিম্নলিখিত কারণে বাংলাদেশে কৃষি খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

#### (১) খাদ্য

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের দরকার। দেশে খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য কৃষির গুরুত্ব খুব বেশি। চাল, গম, তেল, ডাল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ফলমূল, শাকসবজিসহ সব খাদ্যই কৃষি হতে আসে।

#### (২) জীবিকা

গ্রামের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

#### (৩) বৈদেশিক মুদ্রা

কৃষিজ পণ্য, যেমন- পাট, চা, চামড়া, মাছ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়।

#### (৪) শিল্পের কাঁচামাল

চিনিকল, পাটকল, চামড়া কারখানা, চালকল ইত্যাদির কাঁচামাল কৃষি হতে আসে।

#### (৫) জাতীয় আয়

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ কৃষি হতে আসে।

### কৃষিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

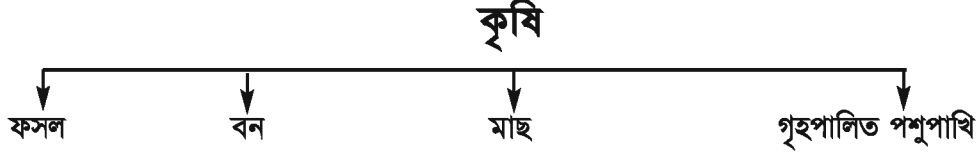
বাংলাদেশের জলবায়ু কৃষির উপযোগী। তথাপি কৃষির বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম। জাতীয় আয় বাড়তে হলে কৃষির উৎপাদন বাড়ান আবশ্যিক। কৃষিশিক্ষার প্রসার ঘটলে সকল স্তরের মানুষ কৃষি সম্বন্ধে জানবে। মানুষ কৃষিশিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হলে ফসল, মাছ, পশুপাখি ও বন চাষের প্রয়োজনীয়তা বুঝবে। তখন তাদের মধ্যে চাষাবাদে উৎসাহ জাগবে। এই উৎসাহ তাদেরকে—

(ক) কৃষির সমস্যা ও সমাধান খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।

(খ) নতুন কলাকৌশল ব্যবহার করতে প্রেরণা যোগাবে।

### কৃষির প্রধান পাঠ্য বিষয়

ফসল, পশুপাখি, বন ও মাছ কৃষিশিক্ষার প্রধান পাঠ্য বিষয়। কৃষিশিক্ষার এ সব বিষয় একে অপরের সঙ্গে জড়িত। এসব বিষয় মিলেই একটি এলাকার কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কৃষির প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিম্নলিখিতভাবে সাজান যায়।



### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

- কোনটি কৃষি উৎপাদিত পণ্য?  
ক. চালকল  
খ. ফলমূল  
গ. পাটকল  
ঘ. চিনিকল
- মাটির জৈবিক ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত -  
ক. জমি চাষ  
খ. ফসল পরিচর্যা  
গ. মাছের চাষ  
ঘ. সার ব্যবহার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্কুলের কৃষি শিক্ষক জনাব আহাদ কৃষি ল্যাবরেটরি দেখাতে গেলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির পাশাপাশি সংরক্ষণকৃত মাছ, পশুপাখি ও গাছপালা দেখে বেশ আনন্দ লাভ করে। এটি ছিল তাদের জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা।

- কৃষি ল্যাবরেটরি পরিদর্শনের কারণ-  
i. আনন্দ উপভোগ করা  
ii. ব্যবহারিক ক্লাস করা  
iii. বিদ্যালয় ভবনের সাথে পরিচিত হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i  
খ. ii  
গ. iii  
ঘ. i, ii ও iii
- কৃষির প্রধান পাঠ্য বিষয়সমূহ -  
ক. মাছ, বন, উদ্যান ও পশু  
খ. খামার, যন্ত্রপাতি, মাছ, পাখি ও বন  
গ. ফসল, বন, পশুপাখি ও মাছ  
ঘ. কৃষি যন্ত্রপাতি, মাছ, বন ও মৎস্য

#### সৃজনশীল প্রশ্ন

৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী শুব্র গ্রীষ্মের ছুটিতে দাদার বাড়ি বরিশালে বেড়াতে গিয়ে দেখল গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ হালচাষ করছে, কেউবা করছে মাছ চাষ ও অন্য কিছু। সম্মুখীন দেখল তার দাদার কাছে গ্রামের অনেকেই কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইছেন। শুব্র তার দাদাকে বলল যে, সে তার কৃষিশিক্ষা বই থেকে কৃষি সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় জেনেছে এবং প্রয়োজনে সে তাদেরকে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবে।

- কৃষি কী?
- কৃষিশিক্ষা প্রসারের অন্যতম একটি প্রভাব বর্ণনা কর।
- কৃষিশিক্ষা বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা শুব্র কীভাবে গ্রামের কৃষকদের সহায়তা করতে পারে তা বর্ণনা কর।
- কৃষির উন্নয়নে কৃষিশিক্ষার জ্ঞান কী ভূমিকা পালন করতে পারে তা ব্যাখ্যা কর।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### কৃষি ও মাটি

#### মাটি কী?

ভূপৃষ্ঠের নরম আস্তরণ যা উদ্ভিদ জন্মানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে মাটি বলে। গাছপালা জন্মান ও বেড়ে উঠার জন্য এবং ফুল ও ফল উৎপাদনের জন্য মাটিতে শিকড় বিস্তার করে মাটি থেকে দরকারি পুষ্টি ও পানি শোষণ করে। শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে গাছকে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি যোগায়।

#### কৃষিতে মাটির ভূমিকা

কৃষি কাজে মাটির ভূমিকা অনেক। কোন মাটিতে কী ফসল উৎপাদন করা যায় তা নিম্নরূপ গুণাবলির ওপর নির্ভর করে।

- (১) মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা
- (২) অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব
- (৩) বুনট
- (৪) গাছের দরকারি পুষ্টির উপস্থিতি।

তাই একটি এলাকার মাটি পরীক্ষা করে নির্ধারণ করতে হয়, সে এলাকা কোন কোন ফসল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত।

#### মাটির উপাদান

মাটি প্রধানত চারটি উপাদান দ্বারা গঠিত।

উপাদানগুলো হল নিম্নরূপ।

- (১) খনিজ পদার্থ বা অজৈব পদার্থ
- (২) জৈব পদার্থ
- (৩) পানি এবং
- (৪) বায়ু

#### খনিজ পদার্থ

খনিজ পদার্থ হচ্ছে আদি শিলার চূর্ণ বিচূর্ণ অংশ।

বালিকণা, পলিকণা ও কদমকণা হচ্ছে মাটির খনিজ পদার্থ।

#### জৈব পদার্থ

গাছপালা ও জীবজন্তুর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে যে পদার্থ তৈরি

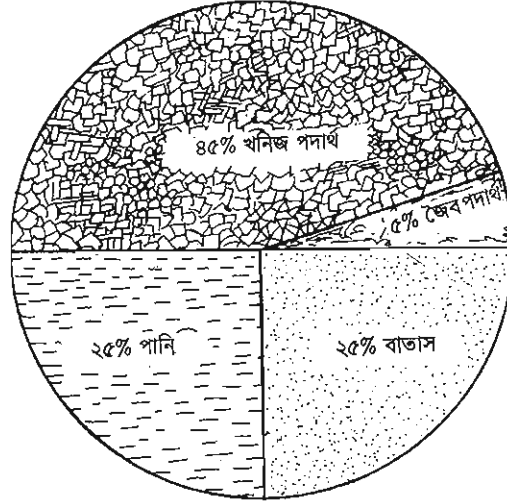
করে তাকে জৈব পদার্থ বলে। জৈব পদার্থ মাটির জীবন। কারণ জৈব পদার্থ গাছের দরকারি পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে ও সরবরাহ করতে সহায়তা করে। জৈব পদার্থ মাটির রস ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। জৈব পদার্থকে আশ্রয় করে অনেক অণুজীব ও জীব মাটিতে বসবাস করে মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়।

#### পানি

পানি মাটিতে গাছের পুষ্টি উপাদানকে দ্রবীভূত করে রাখে। ফলে গাছ মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান সহজে শোষণ করতে পারে।

#### বায়ু

মাটিতে অবস্থিত বায়ু গাছপালার শিকড়, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অন্যান্য অণুজীবের শ্বসনের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে।



মাটির গঠন উপাদান



## মাটির প্রকারভেদ

মাটির বিভিন্ন প্রকার কণা বিভিন্ন অনুপাতে মিশে মাটির যে গঠন তৈরি করে তাকে মাটির বুনট বলে। মাটির কণা বলতে মাটিতে অবস্থিত বালি, পলি ও কর্দম কণাকে বোঝায়। মাটির এসব কণা বিভিন্ন অনুপাতে মিশে বিভিন্ন প্রকার মাটির সৃষ্টি করে। যেমন – বেলে মাটি, এঁটেল মাটি ও দোআঁশ মাটি।

### বেলে মাটি

বেলে মাটিতে বালিকণার ভাগ বেশি। বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা খুব কম। জৈব পদার্থের পরিমাণও খুব কম থাকে বলে এ মাটি অনুর্বর। মোটা কণায়ুক্ত বেলে মাটিতে ফসলের চাষ করা যায় না। বেলে মাটিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করে বা সবুজ সারের চাষ করে উর্বরতা বাড়ান যায়।

### দোআঁশ মাটি

এ মাটিতে প্রায় সমঅনুপাতে বালি, পলি ও কর্দম কণা থাকে। এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা মাঝারি। পানি নিষ্কাশন অবস্থাও বেশ ভাল। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ফসল উৎপাদন উপযোগিতার ক্ষেত্রে দোআঁশ মাটি সবচেয়ে ভাল।

### এঁটেল মাটি

এঁটেল মাটিতে কর্দম কণার ভাগ বেশি থাকে। এঁটেল মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি। তাই পানি নিষ্কাশন একটা সমস্যা। এঁটেল মাটিতে পানি দিলে মাটি খুব নরম হয়। আবার শুকিয়ে গেলে খুব শক্ত হয়ে যায়। তাই শুকনা মাটি লাঙল দিয়ে চাষ করা বেশ কষ্টকর হয়।

## ফসলের জমি নির্বাচন

সূক্ষ্ম কণায়ুক্ত বেলে মাটিতে চিনা, কাউন, চীনাবাদাম, মিষ্টি আলু, তরমুজ ও ফুটির চাষ করা যায়।

দোআঁশ মাটিতে সব রকমের ফসল উৎপাদন করা যায়। এঁটেল মাটিতে প্রধানত ধান ভাল হয়।

## ব্যবহারিক

বিষয় : মাটির নমুনার বুনট পরিচিতি

### উপকরণ

(১) পাত্র (২) মাটির শুকনা নমুনা (৩) পানি

### কাজের ধাপ

- (১) পাত্রে রাখা নমুনা মাটি হতে একমুঠ গুঁড়া মাটি হাতে নাও। তারপর কিছু পানি মিশিয়ে দলা বানানোর চেষ্টা কর।
- (২) যদি দলা বানান না যায় তাহলে তা হবে বেলে মাটি।
- (৩) যদি দলা বানান যায় তাহলে তা লম্বা গোলাকার করে তা দিয়ে আর্থট বানানোর চেষ্টা কর। যদি ফেটে যায় তাহলে বুঝবে দোআঁশ মাটি।
- (৪) যদি লম্বা গোলাকার দলা মাটি দিয়ে আর্থট বানান যায় তাহলে বুঝবে এঁটেল মাটি।
- (৫) নমুনা মাটি পরীক্ষার পর এবার স্কুলের পাশের মাঠের মাটি দিয়ে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নাও কোনটি কোন মাটি।
- (৬) এবার ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় মাটির বুনট পরীক্ষার তথ্যাদি লেখ।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. আদর্শ মাটিতে পানির পরিমাণ কত?
 

ক. এক চতুর্থাংশ	খ. অর্ধাংশ
গ. এক পঞ্চমাংশ	ঘ. দুই তৃতীয়াংশ
২. মাটির প্রধান উপাদান কোনটি?
 

ক. পানি	খ. বায়ু
গ. অজৈব পদার্থ	ঘ. জৈব পদার্থ
৩. দোআঁশ মাটিতে-
  - i. প্রায় সমঅনুপাতে বালি, পলি ও কর্দম কণা থাকে
  - ii. পানি না দিলে মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়
  - iii. পানি দিলে তা ধরে রাখার ক্ষমতা মাধ্যম পর্যায়ে

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

দশ বছর আগে আতিকের একখণ্ড জমিতে পানি সেচ দেওয়ার পরক্ষণেই শুকিয়ে যেত। জমিটির উর্বরতাও কম ছিল। তাই বলে সে ঐ জমিতে ফসলের চাষাবাদ বন্ধ রাখে নি। বরং বেছে বেছে কিছু ফসলের চাষ করত। কিন্তু বর্তমানে ঐ জমিতে প্রায় সব ধরনের ফসলেরই চাষ করা যায়।

৪. দশ বছর আগে আতিক তার জমিতে কোন ফসলের চাষ করতো?
 

ক. ধান	খ. ভুট্টা
গ. কলা	ঘ. তরমুজ
৫. বর্তমানে আতিকের জমিতে -
  - i. জৈব পদার্থের পরিমাণ বেড়েছে
  - ii. অণুজীব বসবাসের অসুবিধা হয়েছে
  - iii. অণুজীব বসবাসের সুবিধা হয়েছে

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

সোহেল তার বাবার সাথে তাদের বাড়ির নিকটবর্তী একটি জমিতে ধান চাষ করল। আশানুরূপ ফলন না হওয়ায় সে কৃষি অফিসের এক কর্মকর্তার সহায়তায় জমির মাটি পরীক্ষা করে এবং জানতে পারে ঐ জমির মাটি তরমুজ চাষের উপযোগী।

- ক. মাটি কী?
- খ. ঐ জমিতে ধানের আশানুরূপ ফলন না হওয়ার একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. সোহেলের জমিটিকে কীভাবে সব ধরনের ফসল চাষ উপযোগী করা যায় তা বর্ণনা কর।
- ঘ. জমির মাটি পরীক্ষা না করে ফসল চাষ করার ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### উদ্ভিদের পুষ্টি ও সার

উদ্ভিদের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে যেসব পদার্থ দরকার হয় সেসব পদার্থকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলা হয়। এসব পদার্থের যে কোন একটির অভাবে গাছ তার জীবনচক্র সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না এবং অন্য কোনো বিকল্প পদার্থ দিয়ে তা পূরণ করা যায় না।

#### উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান

##### শ্রেণীবিভাগ

উদ্ভিদের এসব পুষ্টি উপাদানকে প্রয়োজনের পরিমাণের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

(ক) মুখ্য পুষ্টি উপাদান ও (খ) গৌণ পুষ্টি উপাদান।

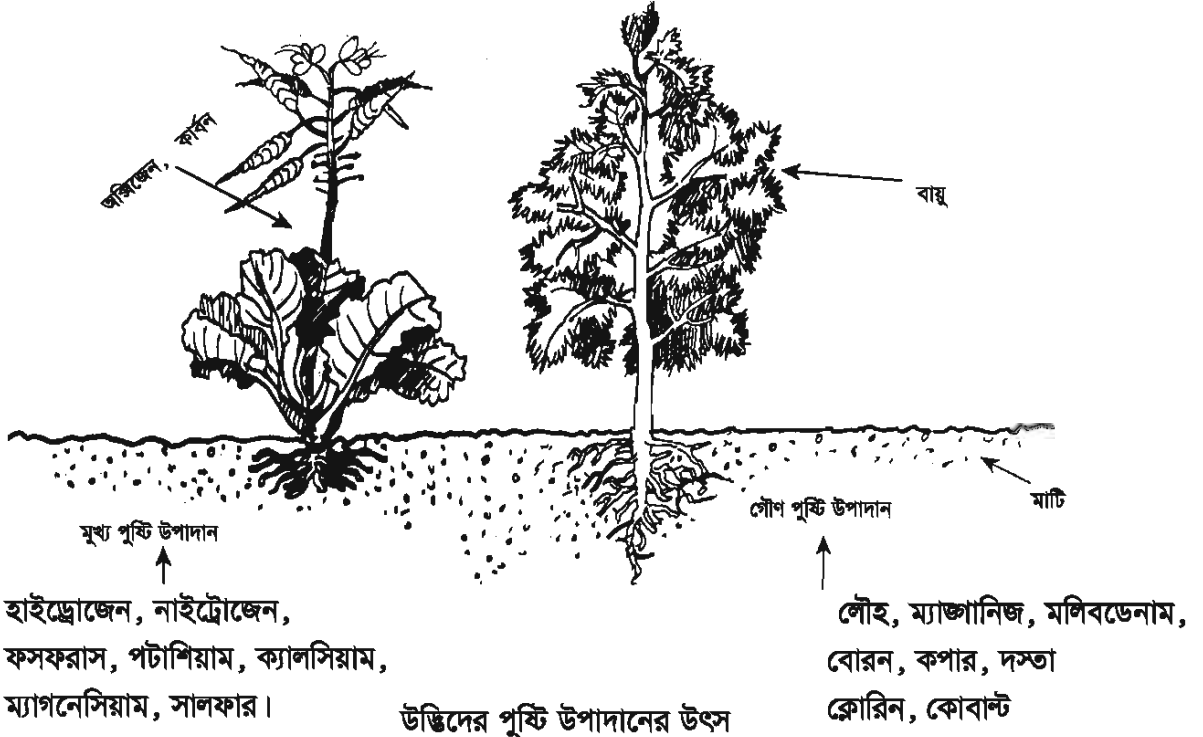
##### মুখ্য পুষ্টি উপাদান

যেসব পুষ্টি উপাদান পরিমাণে বেশি দরকার হয় সেগুলোকে মুখ্য পুষ্টি উপাদান বলা হয়। উদ্ভিদের মুখ্য পুষ্টি উপাদানগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) কার্বন, (২) অক্সিজেন, (৩) হাইড্রোজেন, (৪) নাইট্রোজেন, (৫) ফসফরাস, (৬) পটাশিয়াম, (৭) ক্যালসিয়াম, (৮) ম্যাগনেসিয়াম এবং (৯) গন্ধক/ সালফার।

##### গৌণ পুষ্টি উপাদান

যেসব পুষ্টি উপাদান পরিমাণে কম দরকার হয় সেগুলোকে গৌণ পুষ্টি উপাদান বলা হয়। উদ্ভিদের গৌণ পুষ্টি



উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

- |           |                 |             |             |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| (১) লৌহ   | (২) ম্যাঙ্গানিজ | (৩) বোরন    | (৪) তামা    |
| (৫) দস্তা | (৬) মলিবডেনাম   | (৭) ক্লোরিন | (৮) কোবাল্ট |

## উৎস

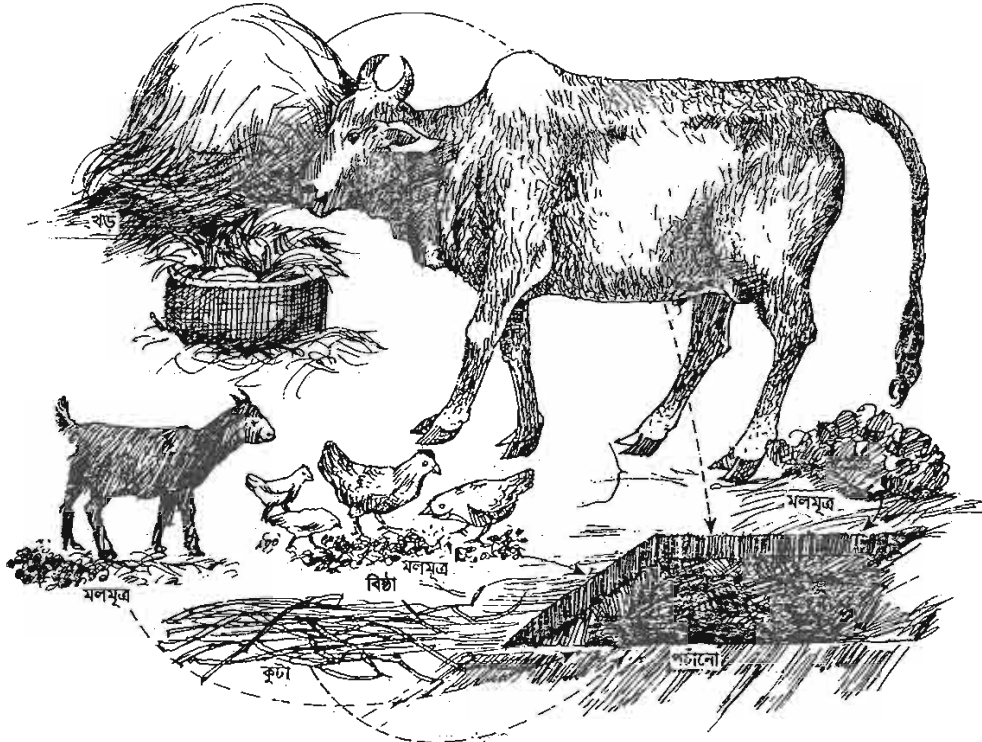
উদ্ভিদ তার পুষ্টি উপাদানের মধ্যে কার্বন, বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড হতে এবং অক্সিজেন বাতাস ও পানি ৭ হতে গ্রহণ করে। হাইড্রোজেন পানি হতে গ্রহণ করে। বাকি ১৪টি পুষ্টি উপাদান মাটি থেকে গ্রহণ করে থাকে।

## সার

মাটিতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহকারী দ্রব্যকে সার বলে। উদ্ভিদ মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে। সুতরাং বছরের পর বছর একই জমিতে শস্য চাষ করলে মাটিতে অবস্থিত পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ কমে যায়। শস্য চাষের ফলে যাতে পুষ্টি উপাদান কমে না যায় সে জন্য জমিতে পুষ্টি উপাদান প্রয়োগ করতে হয়। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় ১৭টি পুষ্টি উপাদানের মধ্যে আমাদের দেশেও বর্তমানে ৫-৬টি পুষ্টি উপাদান সার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সার সাধারণত দুই প্রকার। যথা- (১) জৈব সার ও (২) রাসায়নিক বা অজৈব সার।

## জৈব সার

জৈব পদার্থ যথা, উদ্ভিদ ও প্রাণিজ পদার্থ থেকে উৎপাদিত সারকে জৈব সার বলা হয়। খামারের সার, কমপোস্ট, সবুজ সার, খৈল, হাড়ের গুঁড়া, মাছের গুঁড়া ইত্যাদি জৈব সার।



খামারে জৈব সার তৈরি

জৈব সারের মধ্যে গাছের প্রয়োজনীয় প্রায় সব পুষ্টি উপাদানই থাকে। মাটিতে জৈব সার পচে গিয়ে উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী পুষ্টি উপাদান তৈরি হয়। জৈব সারের প্রভাব মাটিতে অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। জৈব সার ব্যবহারের ফলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ে এবং পুষ্টি উপাদান ধারণের ক্ষমতাও বাড়ে।

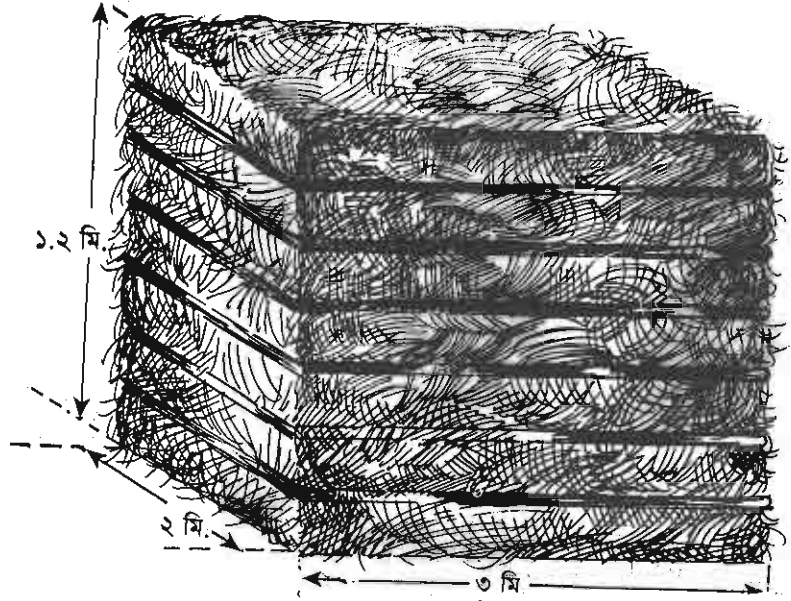
## রাসায়নিক সার

অজৈব পদার্থ হতে রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত সারকে রাসায়নিক সার বলে। ইউরিয়া, এমোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, মিউরেট অব পটাশ ও দস্তা সারে উদ্ভিদের এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদান থাকে—এতে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণও বেশি থাকে। উদ্ভিদ পুষ্টির প্রকার অনুযায়ী রাসায়নিক সার বিভিন্ন প্রকারের হয়, যথা—

নাইট্রোজেন সার, ফসফরাস সার, পটাশিয়াম সার ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক দেশে এখন মিশ্র সার পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও বর্তমানে মিশ্র সারের ব্যবহার বাড়ছে।

### নাইট্রোজেন সার

নাইট্রোজেন সার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন-ইউরিয়া, এমোনিয়াম সালফেট, এমোনিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি। নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে গাছ দ্রুত বাড়ে।



### ফসফরাস সার

ফসফরাস সার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন- সিঙ্গেল সুপার ফসফেট, ডবল সুপার ফসফেট ও ট্রিপল সুপার ফসফেট। ফসফরাস সার ব্যবহার করলে গাছের ফুল, ফল ও শিকড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়।

### পটাশিয়াম

পটাশিয়াম সার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- মিউরেট অব পটাশ, পটাশিয়াম সালফেট ও পটাশিয়াম নাইট্রেট। পটাশিয়াম সার ব্যবহার করলে গাছের রোগ ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম হয় এবং ফুল ঝরে পড়ে না।

### মিশ্র সার

যে সারে বিভিন্ন পরিমাণে বা গ্রেডে একাধিক উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান থাকে তাকে মিশ্র সার বলে। যেমন- সুফলা ১৫ : ১৫ : ১৫। এতে যথাক্রমে শতকরা ১৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ১৫ ভাগ ফসফেট ও ১৫ ভাগ পটাশ রয়েছে।

## ব্যবহারিক

### বিষয় : সার পরিচিতি

#### উপকরণ

(১) সার রাখার পাত্র (২) পলি ব্যাগ (৩) সারের নমুনা

#### কাজের ধাপ

- (১) এক এক প্রকারের সার এক একটি পাত্রে রাখ।
- (২) বিভিন্ন পাত্রে রাখা সারের নমুনা খুব ভালভাবে দেখ।
- (৩) প্রতিটি সারের নাম, গন্ধ, বর্ণ, আকার-আকৃতি ভালভাবে লক্ষ কর ও খাতায় লেখ।
- (৪) বারে বারে দেখ যাতে সারগুলো মনে রাখতে পার ও পরে চিনতে পার।
- (৫) এবার ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ ও শ্রেণী শিক্ষকের স্বাক্ষর নাও।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. নিচের কোন উপাদানটি গাছ বেশি গ্রহণ করে?

ক. ম্যাঙ্গানিজ

খ. দস্তা

গ. পটাশিয়াম

ঘ. লৌহ

২. নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে-

i. গাছের শিকড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়

ii. গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়

iii. গাছের রোগ বালাই দূর হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

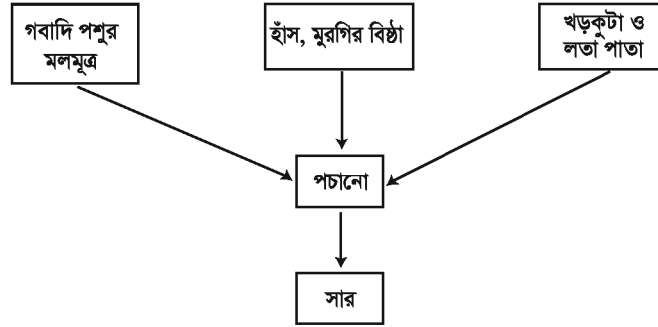
ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের ডায়াগ্রাম থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩. ওপরের ডায়াগ্রামটিতে কী ধরনের সার তৈরি দেখানো হয়েছে?

ক. সবুজ সার

খ. কম্পোস্ট সার

গ. মিশ্র সার

ঘ. অজৈব সার

৪. ডায়াগ্রাম অনুসারে প্রস্তুত সারটি মাটিতে ব্যবহার করলে-

i. উদ্ভিদ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায়

ii. ক্ষেতে পোকামাকড়ের উপদ্রব কমে যায়

iii. মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

আবুল এক খণ্ড জমিতে ৩/৪ বছর ধরে আলু চাষ করে আসছেন। এবারও সেই জমিতে আলু চাষ করেছে। প্রতি বছরই আলুর ফলন একটু একটু কমে যাওয়ায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার প্রতিবেশী সবুর তাকে জমিতে রাসায়নিক সার কম ব্যবহার করে জৈব সার বেশি ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। সবুরের পরামর্শ অনুযায়ী জমিতে জৈব সার ব্যবহারের ফলে পরের বছর আলুর ফলন ভালো হল।

ক. সার কী?

খ. আলুর ফলন ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. জৈব সার প্রয়োগে আবুলের জমিটি কীভাবে পুনরায় উর্বর হয়ে উঠল?

ঘ. অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার জমির জন্য ক্ষতিকর কেন? ব্যাখ্যা কর।

## দ্বিতীয় অধ্যায় শাকসবজি উৎপাদন

### প্রথম পরিচ্ছেদ শাকসবজির পরিচিতি

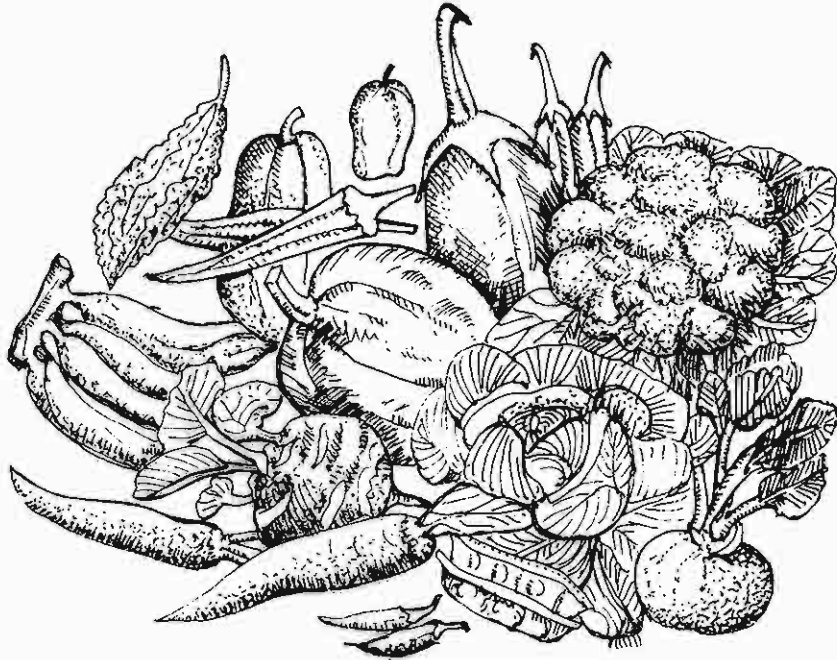
#### সংজ্ঞা ও ধারণা

শাকসবজি বলতে সাধারণত বীৰুৎ জাতীয় গাছপালাকে বোঝায়। তবে গুল্ম ও বৃক্ষ জাতীয় গাছপালাও সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাছপালার নরম ও রসাল অংশই হচ্ছে শাকসবজি। এ ধরনের গাছপালার খাবার উপযোগী অংশ; যেমন- বীজ-মটরশুঁটি; মূল-গাজর, মুলা; টিউবার-আলু, ফল-পেঁপে, বেগুন; কাড-উঁটাশাক, গুঁইশাক, পাতা-লালশাক, লেটুস ইত্যাদি শাকসবজির অন্তর্ভুক্ত। শাকসবজি কাঁচা অথবা রান্না করে খাওয়া যায়। শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আছে। প্রতিদিন শাকসবজি খেলে শরীর ভালো থাকে।

#### শাকসবজির গুরুত্ব

##### খাদ্য

ভালো স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার খাওয়া দরকার। আমাদের দেশের খাদ্য তালিকায় সবচেয়ে বড় স্থান জুড়ে আছে চাউল ও অন্যান্য দানাজাতীয় শস্য। আমাদের দৈনিক মাথাপিছু দানাজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন যেখানে ৫২৮ গ্রাম, সেখানে মূলজাতীয় সবজিসহ শাকসবজির প্রয়োজন মাত্র ১০৪ গ্রাম। আলু ও মিষ্টি আলু বাদ দিলে দৈনিক মাথাপিছু শাকসবজির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৩০ গ্রাম। অন্যান্য দেশ যেমন- ফিলিপাইনে এর পরিমাণ ১৭৪ গ্রাম, থাইল্যান্ডে ১৯৯ গ্রাম, মালয়েশিয়ায় ২১০ গ্রাম, যুক্তরাষ্ট্রে ৪০২ গ্রাম, ইংল্যান্ডে ৪৫৬ গ্রাম ও জাপানে ৫৫০ গ্রাম।



শাকসবজি

প্রকৃতপক্ষে চিনিজাতীয় খাদ্য ও ফল বাদ দিলে উন্নত দেশের খাদ্যে মোটামুটিভাবে শতকরা ২৩ ভাগ দানাজাতীয় খাদ্য, ৪৭ ভাগ শাকসবজি ও ৩০ ভাগ মাছ বা মাংস থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের বেলায় এর পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগ দানাজাতীয় খাদ্য, ১৬ ভাগ শাকসবজি ও ৪ ভাগ মাছ বা মাংস। উপরের তথ্য হতে এটা পরিষ্কার যে আমাদের খাদ্যে শাকসবজির স্থান অতি নগণ্য।

## ভিটামিনের উৎস

### ভিটামিন এ

ভিটামিন ‘এ’ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। চোখের দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখে। এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ত্রিশ হতে চল্লিশ হাজার শিশু ভিটামিন এ-এর অভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক শাকসবজি ভিটামিন এ দিয়ে ভরপুর। লালশাক, কচুশাক, কচুর লতি, মিষ্টিকুমড়া, পুঁইশাক, গাজর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আছে।

### ভিটামিন বি

ভিটামিন বি-এর অভাবে ঠোঁটের কিনারায় ঘা দেখা দেয় ও ক্ষুধা কমে যায়। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন বি দরকার। বরবটি, শিম ও পাতাজাতীয় শাকসবজিতে ভিটামিন বি আছে।

### ভিটামিন সি

ভিটামিন সি দেহকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ভিটামিন সি-এর অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ হয়। এ রোগে দাঁতের মাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে দাঁত নড়বড়ে হয়ে যায়। শরীরে ভিটামিন সি-এর অভাব হলে কাটা ঘা সহজে শুকায় না এবং রক্তনালিকা ফেটে গিয়ে অনেক সময় রক্ত ঝরে। লালশাক, কলমিশাক, উঁটাশাক, টমেটো, কাঁচামরিচ ও বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে।

### খনিজ পদার্থের উৎস

দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য খনিজ পদার্থ দরকার। খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, দস্তা, গন্ধক, ক্রোরিন, কোবাল্ট ও আয়োডিন গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো সময় এগুলোর অভাবে পুষ্টি সমস্যার সৃষ্টি হয়। লৌহ রক্তের একটি উপাদান, শরীরে লৌহের অভাব হলে রক্ত কমে যায়। ক্যালসিয়াম হাড় গঠনে সাহায্য করে।

শাকসবজি যেমন- গাজর, বরবটি, বেগুন, সজিনা ও কচুশাকে প্রচুর লৌহ আছে। দাঁত ও হাড় গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম দরকার। এর অভাবে হাড় ও দাঁত দুর্বল হয়। ডাটা, শিম, টেঁড়স, গাজর ও কচুশাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম আছে।

### অর্থকরী ফসল

পরিবারের খাদ্য, পুষ্টি ও আয়ের জন্য শাকসবজির চাষ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির আশেপাশে, ঘরের ছাদ ও টবে এবং অল্প জায়গায় বিভিন্ন রকমের শাকসবজির চাষ করা যায়। অন্যান্য ফসলের তুলনায় শাকসবজির চাষ করতে জমি কম লাগে এবং সময়ও কম লাগে। এছাড়া বাড়ির মহিলা ও ছেলেমেয়েরা শাকসবজির চাষ করতে পারে। এতে তারা একদিকে যেমন বাগান করার আনন্দ পায়, অন্যদিকে উৎপাদিত শাকসবজি তাদের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটায়। উপরন্তু শাকসবজি বিক্রি করে বাড়তি আয়ও হতে পারে।

### উৎপাদন মৌসুমভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবী জুড়ে শত শত জাতের গাছপালা আছে যা শাকসবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও প্রায় ৬০ জাতের শাকসবজি চাষ করা হয়। এসব শাকসবজিকে উৎপাদনের সময়ের ওপর ভিত্তি করে তিনভাগে ভাগ করা হয় যথা-

(১) শীতকালীন শাকসবজি, (২) গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি ও (৩) বারমাসি শাকসবজি



শীতকালীন শাকসবজি	গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি	বারমাসি শাকসবজি
টমেটো	কাঁকরোল	বেগুন
বাঁধাকপি	চিচিঙ্গা	টেঁড়ুশ
ফুলকপি	পটল	বরবটি
শালগম	পানিকচু	লালশাক
শিম	মুখীকচু	কাঁচাকলা
মুলা	উঁটাশাক	পেঁপে
লাউ	পুঁইশাক	কলমিশাক
পালংশাক	কলমিশাক	শসা
গাজর	মিষ্টিকুমড়া	শিম
লেটুস	চালকুমড়া	কচুপাতা
চায়না কপি	ধুন্দল, বিজ্জা, করলা	

শিম, টমেটো প্রধানত শীতকালীন সবজি। বর্তমানে দুই একটি জাত বের হয়েছে যা গ্রীষ্মকালেও ফলন দিয়ে থাকে। গিমা কলমি নামক কলমিশাক প্রায় সারা বছরই চাষ করা যায়। শসা এবং খিরা মিলিয়ে শসাজাতীয় ফসল সারা বছরই পাওয়া যায় তাই এসব সবজিকে বারমাসি সবজি বলা হয়।

## ব্যবহারিক

**বিষয় : শাকসবজির তালিকা তৈরি**

## কাজের ধাপ

- ১। তোমার গ্রামে বা এলাকার বাজারে যেসব শাকসবজি পাওয়া যায় সেগুলোর নাম সংগ্রহ কর।
- ২। বছরের শুরু হতে এ কাজটি শুরু কর এবং পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত নাম সংগ্রহ কর।
- ৩। এবার পর নিচের ছকে নামগুলো সাজাও।
- ৪। পরিশেষে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ ও শিক্ষককে দেখাও।

[illegible]

ঘ. রাসেলের দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য শাকসবজির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শাকসবজি উৎপাদন পদ্ধতি

### শাকসবজি উৎপাদনের বিবেচ্য বিষয়

শাকসবজি উৎপাদনে বিবেচ্য বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হল।

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| ১। ভালো বীজ               | ২। বীজতলার জমি নির্বাচন ও তৈরি |
| ৩। বীজ বপন ও বীজতলার যত্ন | ৪। মূল জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি |
| ৫। বীজ বপন ও রোপণ         | ৬। পানি সেচ ও নিকাশ            |
| ৭। আগাছা দমন ও মালচিং     | ৮। পোকামাকড় দমন               |
| ৯। রোগ দমন                | ১০। ফসল সংগ্রহ                 |

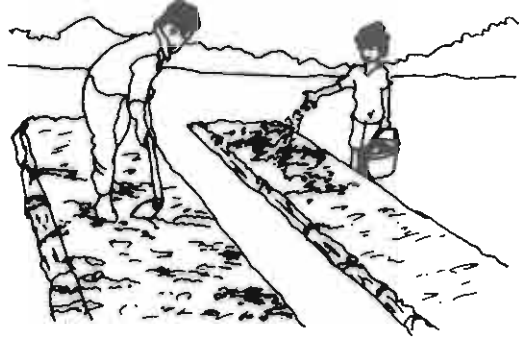
### ভাল বীজ

ভালো বীজ ছাড়া ভালো ফসল আশা করা যায় না। তাই ভালো বীজের গুণাগুণ জানা ও ভালো বীজ সংগ্রহ করা দরকার। নিচে ভালো বীজের গুণগুলো দেওয়া হল।

- (১) জাত : বীজ উচ্চ ফলনশীল জাতের হতে হবে।
- (২) মিশ্রণ : শস্য বীজের সাথে আগাছার বীজ, ভাঙা বীজ, চিটা ও আবর্জনা থাকা চলবে না। ভাঙা ও চিটা বীজ থেকে চারা হয় না। আগাছা ফসলের অনেক ক্ষতি করে।
- (৩) বিশুদ্ধতা : এক জাতের শস্য বীজের সাথে অন্য জাতের শস্য বীজ থাকবে না।
- (৪) গজানোর ক্ষমতা : বীজের কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ গজানোর ক্ষমতা থাকতে হবে।
- (৫) পুষ্টিতা ও আকার : বীজ পরিপুষ্ট ও বড় আকারের হতে হবে।

### বীজতলা তৈরি

বেশিরভাগ সবজির বীজ দিয়ে চারা উৎপাদন করে রোপণ করা হয়। তাই বীজতলা নির্বাচন ও তৈরি সম্বন্ধে ভালভাবে জানা দরকার। যে জমিতে বীজ হতে চারা উৎপাদন করে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত পরিচর্যা করা হয় তাকে বীজতলা বলে। ছায়া পড়ে না এবং প্রচুর আলো বাতাস পায় এমন উর্বর উঁচু জমির দোআঁশ মাটি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জায়গার মাটি ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। তারপর ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১ মিটার প্রস্থ জমি কাঠি দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। এরপর চিহ্নিত জমির মাটির সাথে দুই বা তিন ঝুড়ি পচা গোবর বা খামারজাত সার মিশিয়ে নিতে হবে। দুইটি বীজতলার মাঝে ৫০ সেমি. জায়গা নালায় জন্য রাখতে হবে। নালায় জায়গা থেকে মাটি তুলে বীজতলা উঁচু করতে হবে।

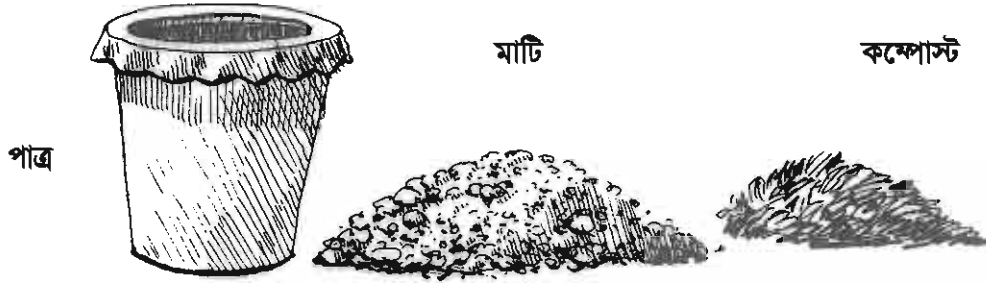


বীজতলা প্রস্তুতকরণ

### পাত্রে বীজতলা তৈরি

প্লাস্টিক বা মাটির তৈরি টব বীজতলা তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সুবিধামত একটি পাত্র নির্বাচন

করে, পাত্রটির ৩ ভাগের ২ ভাগ উর্বর দোঁর্জাশ মাটি এবং ১ ভাগ কমপোস্ট বা পচা গোবর দ্বারা মাটি মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এ মিশ্রণ দিয়ে পাত্র ভরতে হবে।



টবে বীজতলা তৈরি

### বীজ বপন

যেসব বীজের আবরণ শক্ত সেগুলো এক রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর বীজতলায় সমানভাবে ছিটিয়ে দিয়ে বুঁরা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজ খুব ছোট হলে ছাই বা বালির সাথে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।



বীজ বপন ও মাটি দ্বারা আবৃতকরণ

### বীজতলার যত্ন

বীজ গজানোর পর থেকে বিকাল বেলা ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দিতে হবে। পানির ঝাঁঝরি চারার কাছাকাছি রেখে সেচ দিতে হবে। নতুবা চারা গাছ ভেঙে যেতে পারে কয়েক দিন সেচ দেওয়ার পর নিড়ানি দিয়ে মাটি আলাগা করে দিতে হবে। বীজতলায় সকাল বিকাল রোদ লাগাতে হবে। দুপুর বেলা চাটাইয়ের চালা দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।



পানিসেচ



পুনরায় চারা রোপণ

চারার বয়স বাড়ার সাথে সাথে রোদ সহ্য করার ক্ষমতাও বাড়বে। তাই পরে ছায়া দেওয়ার দরকার হবে না। বীজ তলায় আগাছা হলে নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। বীজতলায় চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর চারাগুলোকে উঠিয়ে অন্য কয়েকটি বীজতলায় পাতলা করে রোপণ করতে হয়। এতে সবল ও সতেজ চারা পাওয়া যায়। রোপণের পর চারা যাতে প্রতিকূল অবস্থা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য বীজতলায় থাকাকালীন অবস্থাতেই কষ্টসহিষ্ণু করে তুলতে হবে। ফলে মূল জমিতে রোপণের পর চারা সতেজভাবে বেড়ে উঠবে।



বীজতলায় চারা দেওয়া

### মূল জমি নির্বাচন ও তৈরি

শাকসবজি চাষের জমি নির্বাচনের সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

- ১। দিনের বেশিরভাগ সময় যেন রোদ পড়ে।
- ২। সহজে পানি সরে যায় এমন উর্বর, দোঁরাঁশ মাটির মাঝারি উঁচু জমি হতে হবে।
- ৩। পানি সেচের সুবিধার জন্য জমির কাছাকাছি পুকুর, ডোবা বা টিউবওয়েল থাকতে হবে।

### জমি তৈরি

জমি নির্বাচন করার পর আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমি উঁচু নিচু থাকলে সমান করে নিতে হবে। এরপর লাঙল দিয়ে চাষ দিতে হবে অথবা কোদাল দিয়ে গভীরভাবে কুপিয়ে নিতে হবে। এরপর জমি ৮-১০ দিন রোদে ফেলে রাখতে হবে। তারপর মাটির ঢেলা ভালোভাবে ভেঙে বুরবুরে করে নিতে হবে। জমির মাটি কাদাময় হলে কিংবা বেলে মাটি হলে মাটিতে কমপোস্ট ও গোবর সার ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। যেসব সবজির বীজ খুব ছোট (যেমন-লালশাক, গাজর) এবং ছিটিয়ে বপন করতে হয়, সেক্ষেত্রে জমি বেশি বুরবুরে করে তৈরি করতে হবে। শিম, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি সবজি চাষ করার জন্য মাদা তৈরি করে বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতে হয়। জমি তৈরির সময় জমির উর্বরতা মান ও ফসলের প্রকৃতি বিবেচনা করে জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়।

### বপন ও রোপণ

অনেক শাকসবজির বীজ সরাসরি জমিতে বপন করতে হয়। যেমন- লালশাক, উঁটাশাক, টেঁড়স, বরবটি, গাজর ও মুলা। আবার কিছু কিছু শাকসবজি বীজতলায় চারা উৎপাদন করে, সেই চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। যেমন- বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, লেটুস ও বেগুন।



মাদায় বীজ রোপণ

কিছু কিছু শাকসবজির বীজ মাদা করে সরাসরি বপন করা হয়। আবার ছোট ছোট পলিথিন ব্যাগে বা যে কোন পাত্রে বা মাটিসহ কচুরিপানার মধ্যে বীজ বপন করেও চারা তৈরি করা হয়। এভাবে সাধারণত লাউ, কুমড়া, শিম জাতীয় সবজির চারা তৈরি করে রোপণ করা হয়। আবার কোনো কোনো সবজির লতা, মূল ও কাণ্ড বীজ হিসেবে রোপণ করা হয়, যেমন- পটল, কাঁকরোল, আলু ও কচু।

শাকসবজির বীজ বপন বা চারা রোপণের সময় নিচের বিষয়গুলো খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে :

- (১) যেসব শাকসবজির বীজ খুব ছোট সেসব বীজ বোনার সময় বালি বা ছাই মিশিয়ে নিতে হবে।
- (২) বীজ নির্দিষ্ট দূরত্বে সারি করে বুনতে হবে।
- (৩) যেসব সবজির বীজ শক্ত, যেমন- করলা, চিচিঙ্গা, পালংশাক সেসব সবজির বীজ বোনার আগে কমপক্ষে ২৮ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- (৪) বিকাল বেলা চারা রোপণ করতে হবে।
- (৫) রোপণের পর চারাকে দুপুরের রোদ হতে রক্ষা করার জন্য কলার খোল বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

### পরিচর্যা

ধান, পাট, গম, সরিষা ইত্যাদির তুলনায় শাকসবজি চাষে বেশি পরিচর্যার দরকার হয়। শাকসবজিতে অবশ্যই প্রয়োজন হলে সেচ দিতে হবে। পোকা ও বালাই দেখা দিলে দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

### ফসল সংগ্রহ

সাধারণত শাকসবজি হাত দিয়ে উপড়ে বা দা অথবা কাঁচি দিয়ে কেটে সংগ্রহ করা হয়। ডাঁটাশাক, লালশাক ও মুলা হাত দিয়ে টেনে তোলা হয়। আবার অনেক সবজি আছে, যেমন-লাউ, শসা ও কুমড়া দা বা চাকু দিয়ে কেটে সংগ্রহ করতে হয়। কোনো কোনো সবজি গাছের ফল প্রায় প্রতি দিন সংগ্রহ করতে হয়। যেমন-টেঁড়স, কাঁকরোল, চিচিঙ্গা কুমড়া ও লাউ।

### ফসল সংরক্ষণ

লাউ, শসা, কুমড়া, টেঁড়স, বেগুন, শিম ইত্যাদি সংগ্রহের পর ভালভাবে পরিষ্কার করে ছায়াতে ভিজা কাপড় বা চট দিয়ে ঢেকে রাখা যায়। এছাড়া রোদে শুকিয়ে পলিথিন ব্যাগে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। রেফ্রিজারেটরে শাকসবজি বেশ কিছু দিন সংরক্ষণ করা যায়।

### বিপণন

আমাদের দেশে বাজারের জন্য সাধারণত শাকসবজি বাঁশের ঝড়িতে ভর্তি করে পাঠান হয়। দূরে কোথাও পাঠাতে হলে চটের বস্তাও ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে ফসল সংগ্রহের পর বাছাই করে ফসল উপযোগী পাত্রে প্যাকিং করে পাঠাতে হয়।

## ব্যবহারিক

### বিষয় : শাকসবজির বীজ পরিচিতি

#### উপকরণ

- (১) কাঠ বা হার্ড বোর্ডের মাঝারি আকারের একটি বাজ্র।
- (২) পলিথিন বা কাগজের ছোট ছোট প্যাকেট (১২ সে.মি. x ৮ সে.মি.)।
- (৩) শাকসবজির বীজের নাম লেখার জন্য কার্ড বা কাগজ (১০ সে.মি. x ৬ সে.মি. আকারের)।

#### কাজের ধাপ

- (১) কাঠ বা হার্ড বোর্ড দিয়ে একটি ৩০ সে.মি. x ১৫সে.মি. x ১৫ সে.মি. আকারের একটি বাজ্র তৈরি কর।
- (২) তোমার গ্রামে বা এলাকার বাজারে যে সব শাকসবজির বীজ পাওয়া যায় তা সংগ্রহ কর।
- (৩) এক ধরনের বীজ একটি প্যাকেটে রাখ।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ কয়েকটি শাকসবজির চাষ

### বেগুন

বেগুন দেশের একটি জনপ্রিয় সবজি। বেগুন সারা বছর পাওয়া যায় এবং সকল স্তরের মানুষের কাছে প্রিয়।

#### জাত

ইসলামপুরী, শিখোথ, উত্তরা, নয়নকাজল, মুক্তকেশী, খটখটিয়া, তারাপুরী, নয়নতারা ও কাজলা।

#### চারা উৎপাদন

বেগুন চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শীতকালীন বেগুন চাষের জন্য শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হতে আশ্বিন মাস এবং বর্ষাকালীন বেগুন চাষের জন্য চৈত্র মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বালি, কমপোস্ট ও মাটি সমপরিমাণে মিশিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হয়। সবল চারা পাওয়ার জন্য প্রথমে একটি বীজতলায় বীজ বুনতে হয়। বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণ করতে হয়। এতে চারা স্বাস্থ্যবান হয়। প্রতি ৩ মিটার x ১ মিটার আকারের বীজতলায় প্রায় ৮-১০ গ্রাম বীজ বপন করতে হয়। চারার বয়স ৩৫-৪০ দিন হলে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়।



বেগুন গাছ

#### জমি নির্বাচন

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে পানি অপসারণের ভাল ব্যবস্থা থাকলে ঐটেলে ও দোআঁশ মাটিতেও বেগুনের চাষ করা যায়।

#### জমি তৈরি ও চারা রোপণ

জমি তৈরির জন্য ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। ভাল ফসল পেতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।

#### সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

বেগুন চাষের জন্য নিম্নোক্ত পরিমাণ সার ব্যবহার করতে হবে। এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমির জন্য সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গোবর, টিএসপি ও এমপি সার শেষ চাষের সময় মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন পর প্রথম কিস্তি, ফল ধরা শুরু করলে ২য় কিস্তি এবং ফল সঞ্চারের মাঝামাঝি সময়ে ৩য় কিস্তি চারা গাছের মাঝখানের মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।



## বেগুনের সারের পরিমাণ ৪০ বর্গমিটার জমির জন্য

সার	পরিমাণ	শেষ চাষের সময় দিতে হয়	কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ		
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবর বা কমপোস্ট	১০০ কেজি	সম্পূর্ণ সার	—	—	—
ইউরিয়া	১৫০০ গ্রাম	—	৫০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০০ গ্রাম	সম্পূর্ণ সার	—	—	—
এম পি	১০০০ গ্রাম	সম্পূর্ণ সার	—	—	—

## চারারোপণ

এক মাস বয়সের সবল চারা কাঠির সাহায্যে তুলে নিতে হবে। চারা গাছের শিকড়ের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এরপর ৭৫ সেমি. দূরত্বের সারিতে ৬০ সেমি. দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে। রোপণের পর সেচ দিতে হবে।

## পরিচর্যা

মাটিতে রসের অভাব হলে বা মাটি শুকিয়ে গেলে ১০-১৫ দিন পর পানি সেচ দিতে হবে। আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। গাছ সোজা রাখতে কাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

## বেগুনের ডগা ও ফলের পোকা

বেগুনের প্রধান শত্রু ডগা ও ফলের ছিদ্রকারী পোকা। এই পোকা বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্র করে। ফলে বেগুন খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। বেগুনের ক্ষেত থেকে ছিদ্রযুক্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে কাটলে পোকাকার কিড়া দেখা যাবে। দমনের জন্য আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এছাড়াও ম্যালাথিয়ন বা সুমিথিয়ন নামক কীটনাশকের যে কোন একটি ১০ লিটার পানিতে ১০ মি. লি. মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

## ফসল সংগ্রহ ও ফলন

চারারোপণের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে। ফুল ফোটা হতে মাস খানেকের মধ্যে বেগুন খাওয়ার উপযুক্ত হয়। বেগুনের ফল তার বীজ শক্ত হওয়ার আগেই সংগ্রহ করতে হয়। বিভিন্ন জাতের মধ্যে বেগুনের ফলনের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণত প্রতি শতকে বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ১৪০ কেজি বেগুন উৎপন্ন হয়। উত্তরা বেগুন ২৫০ কেজি পর্যন্ত ফলন দেয়।

## বিপণন

বেগুন ফসল সংগ্রহের পর ঠান্ডা ও খোলা জায়গায় কয়েক দিন সংরক্ষণ করা যায়। তাই সংগ্রহের পরপরই ঝুড়িতে বা বস্তায় বাজারে পাঠান যেতে পারে। তবে বস্তায় বেশিক্ষণ রাখা ঠিক হবে না।

## পুইশাক

পুইশাক বাংলাদেশের প্রধান গ্রীষ্মকালীন পাতাজাতীয় সবজি, তবে সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়। পুইশাক সাধারণত বসন্তবাড়ির আঙিনার বেড়ায় বা মাচায় জন্মাতে দেখা যায়। পুইশাক একটি কোমল কাণ্ড বিশিষ্ট বর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ।

### জাত

পুইশাকের দুইটি জাতের চাষ হয়ে থাকে। যথা—

১। লাল পুইশাক ২। সবুজ পুইশাক।

### জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

সাধারণত মার্চ-এপ্রিল বা চৈত্র মাস পুইশাক লাগানোর ভাল সময়। তবে সেচের সুবিধা থাকলে ফাল্গুন মাস হতেই এর চাষ করা যেতে পারে। চারা রোপণের পূর্বে জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরি করে নিতে হবে।

পুইশাক চাষে গোবর বা কমপোস্ট সার ব্যবহার করা ভাল। এতে মাটির গুণাগুণ বজায় থাকবে ও পরিবেশ রক্ষা হবে। পুইশাকের জন্য প্রতি শতকে বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
গোবর সার	৬০ কেজি
ইউরিয়া	৯০০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমপি	৪০০ গ্রাম

ইউরিয়া ছাড়া বাকি সব সার জমি তৈরির শেষ চাষে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া চারা রোপণের ১৫ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক এক মাস পর দুই সারির মাঝখানের মাটিতে প্রয়োগ করে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে অবশ্যই পানি সেচ দিতে হবে।

### বপন ও রোপণ

বীজ ও শাখা কলম দিয়ে পুইয়ের চাষ করা যায়। তবে বীজ দিয়ে চারা তৈরি করে এবং তা রোপণ করে চাষ করাই ভালো। পুইশাকের চারা ৬০-৮০ সেমি দূরে দূরে সারি করে ও সারিতে ৫০ সেমি দূরে দূরে রোপণ করতে হবে।

### পরিচর্যা

জমিতে আগাছা জন্মাতে দেওয়া যাবে না। নিড়ানি দিয়ে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। খরার সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। সেচের পর নিড়ানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। জমিতে যাতে পানি না জমে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

### ফসল সংগ্রহ

পুইশাকের ডগা লম্বা হতে শুরু করলেই ডগা কেটে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে ডগা কেটে সংগ্রহ করলে নতুন ডগা গজাবে। নতুন ডগা কয়েকবার কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়।



পুইশাক

## লালশাক

লালশাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ আছে। লালশাকের গাছ খাটো, এর কাণ্ড ফাঁপা, পাতার রং লাল। লালশাকে প্রচুর ক্যালসিয়ামও আছে।

### জাত

লালশাকের বিভিন্ন জাত সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। অনুমোদিত কোনো জাত নেই। তবে বারি লালশাক-১ নামে একটি জাত বেশ জনপ্রিয়।

### জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

লালশাকের বীজ খুব ছোট। তাই লালশাক চাষ করতে জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে তৈরি করতে হয়। প্রতি শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে নিম্নলিখিত পরিমাণ সার দিতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ
গোবর সার বা কমপোস্ট সার	৬০ কেজি
ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম
টিএসপি	৩০০ গ্রাম
এমপি	২৫০ গ্রাম



লালশাক

লালশাক স্বল্পমেয়াদি ফসল তাই অর্ধেক ইউরিয়া সার রেখে সব সার জমি তৈরির শেষ চাষে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া চারা গজানোর ১৫ দিন পর গাছের সারির মাঝের মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

### বীজ বপন

প্রতি শতক জমির জন্য ৮-১০ গ্রাম বীজের দরকার হবে। বীজ খুব ছোট হলে বীজে সমপরিমাণ বালি বা ছাই মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর ২০ সেমি. দূরে লাইন করে লাইনের মাঝখানে বীজ বুনতে হবে। একটি বীজ থেকে অন্যটি ৫-৭ সেমি. দূরত্বে থাকা দরকার।

### পরিচর্যা

নিয়মিত নিড়ানি দিয়ে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। মাটি শুকিয়ে গেলে ঝাঁঝারি দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই জমিতে পানি জমে না থাকে। মাটি চটা লেগে গেলে নিড়ানি দিয়ে আলগা করে দিতে হবে। চারা খুব ঘন হয়ে গেলে পাতলা করে দিতে হবে।

### ফসল সংগ্রহ

বীজ বপনের এক মাস পর ফসল সংগ্রহ করা যায়। যেসব গাছ অন্য গাছের তুলনায় একটু বড় সেগুলো প্রথমে তুলতে হবে। দুই তিন দিন পর পর এভাবে ফসল সংগ্রহ করা যেতে পারে। লালশাকের ফলন প্রতি শতকে ৪০-৫০ কেজি হতে পারে।

## মিষ্টিকুমড়া

মিষ্টিকুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ থাকে। এর ফল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়। তবে এর

প্রধান ব্যবহার পাকা অবস্থায়। কুমড়ার পাতা ও কচি ডগা খাওয়া যায়। মিষ্টিকুমড়া সচরাচর বৈশাখী, বর্ষাতি ও মাঘী এ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

### চাষের সময়

বৈশাখী কুমড়ার বীজ মাঘ মাস, বর্ষাতি কুমড়ার বীজ বৈশাখ ও মাঘী কুমড়ার বীজ শ্রাবণ মাসে রোপণ করতে হয়।

### মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ

মাদার জন্য সাধারণত ৩-৪ মিটার দূরত্বে ৮০-১০০ ঘন সেমি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে গোবর বা কমপোস্ট ৫ কেজি, ইউরিয়া ১৩০ গ্রাম, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমপি ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ৯০ গ্রাম ও দস্তা সার ৫ গ্রাম দিতে হবে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার বীজ বোনার ৮-১০ দিন আগে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া দুইভাগে বীজ বোনার ১০ দিন পর প্রথমবার ও ৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাদার চারপাশে অগভীর একটি নালা কেটে সার নালা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।



মিষ্টিকুমড়া

### বীজ বপন

মাদা তৈরি হতে ১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি বীজ মাদার মাঝখানে রোপণ করতে হবে।

### পরিচর্যা

আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করে চারা গাছের গোড়ায় কিছুটা মাটি তুলে দিতে হবে। মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। গোড়ার কাছাকাছি কিছু খড় ১৫-২০ দিন পর বিছিয়ে দিতে হবে। ফল ধরা শুরু করলে ফলের নিচেও খড় বিছিয়ে দিতে হবে। বৈশাখী কুমড়া মাটিতে হয়, অন্যান্য কুমড়ার জন্য মাচার ব্যবস্থা করতে হয়। গাছের লতাপাতা বেশি হলে কিছু লতাপাতা ছেঁটে দিতে হবে। কুমড়ার ফল ঠিকমত ধরার জন্য ফুল ফোটার পর পর পুরুষজাতীয় ফুল নিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরের গায়ে বুলিয়ে দিতে হবে।

### ফসল সংগ্রহ

মিষ্টিকুমড়া কচি অবস্থা থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ পাকা অবস্থায় খাওয়া যায়। তাই কচি অবস্থা থেকেই ফসল সংগ্রহ শুরু হয়। কুমড়া বেশ পাকিয়ে সংগ্রহ করলে অনেকদিন ঘরে রাখা যায়। শতক প্রতি ফলন ৮০-১০০ কেজি হতে পারে।

## টমেটো

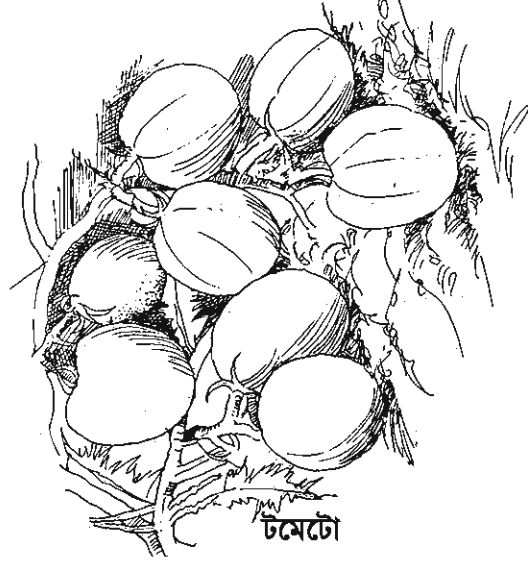
টমেটো শীতকালীন সবজি। বাংলাদেশে টমেটো বিলাতি বেগুন নামে পরিচিত। এই সবজি ভিটামিনসমৃদ্ধ, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু।

### জাত

পৃথিবীতে টমেটোর বহু জাত আছে। বাংলাদেশে চাষকৃত জাতগুলো হল অক্সহাট, মারগ্লোব, মানিক, রতন, বাহার ও অনুপমা।

## বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন

বীজতলা (৩ মি x ১ মি) সমপরিমাণ বালি ও মাটি মিশিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। তারপর ১০ গ্রাম বীজ বপন করতে হয়। বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর গজানো চারা তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণ করতে হয়। এতে চারা স্বাস্থ্যবান ও সবল হয় এবং ফলন ভাল হয়। আগাম চাষের জন্য ভাদ্র মাসে বীজ বপন করতে হয়। এ সময় সম্ভব না হলে মাটির টবে বা পলিথিন ব্যাগে চারা উৎপাদন করা যেতে পারে। নাবী ফসলের জন্য কার্তিক মাসের শেষ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।



টমেটো

## জমি নির্বাচন

উঁচু, মাঝারি উঁচু, উর্বর দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

## জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

মাটি ৪-৫ বার চাষ মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরি করে নিতে হবে।

টমেটো চাষের জন্য প্রতি ৪০ বর্গমিটার জমিতে নিম্নলিখিত পরিমাণ সার দিতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ
কমপোস্ট বা গোবর	৬০ কেজি
ইউরিয়া	২০০০ গ্রাম
টিএসপি	১৮০০ গ্রাম
এমপি	৯০০ গ্রাম

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, অর্ধেক ইউরিয়া, সব টিএসপি ও পটাশ ব্যবহার করতে হবে। বাকি ইউরিয়া চারা লাগানোর তিন সপ্তাহ পর অর্ধেক এবং ৫ সপ্তাহ পর বাকি অর্ধেক টমেটো গাছের দুই সারির মাঝের মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে সেচ দিতে হবে।

## চারা রোপণ

চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে রোপণের উপযোগী হয়। এ সময় প্রতিটি চারায় ৫-৬টি পাতা থাকে। তবে বিশেষ অবস্থায় ৬০ দিন বয়সের চারাও রোপণ করা চলে। টমেটোর চারা ১ মিটার প্রস্থ ও ৩০ সেমি উঁচু ভেলিতে লাগাতে হবে। ভেলির দৈর্ঘ্য জমির আকারের ওপর নির্ভর করে। এভাবে চারা রোপণ করতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪০ সেমি রাখতে হবে। পানিসেচ, অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ও নিকাশের সুবিধার জন্য দুইটি ভেলির মাঝে ৫০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে।

## অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি সার প্রয়োগের আগে পার্শ্বকুঁশি ছাঁটাই করে দিতে হবে। টমেটোর ভাল ফলন পেতে দুটি সারির মাঝামাঝি ইংরেজি 'A' এর মত বাঁশের তৈরি কাঠামো দিয়ে ঠেকনা দিতে

হবে। টমেটো চাষের জন্য ৪-৫ বার সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চারা লাগানোর পর হালকা সেচ ও প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। এছাড়াও মাটিতে রসের অভাব হলে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।

### ফসল সংগ্রহ

চারা রোপণের দুই মাস পর হতে টমেটো পাকা শুরু করে। টমেটো ২-৩ মাস ধরে ফল দেয়। ফলের গায়ে লালচে রং দেখা দিলে বোঁটা থেকে কেটে ফল সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত টমেটোর ফলন প্রতি শতকে বা ৪০ বর্গমিটারে ১১০ কেজি পাওয়া যায়। অনুপমা জাতের টমেটোর ফলন প্রতি শতকে ২০০ কেজি পর্যন্ত হয়।

### শিম

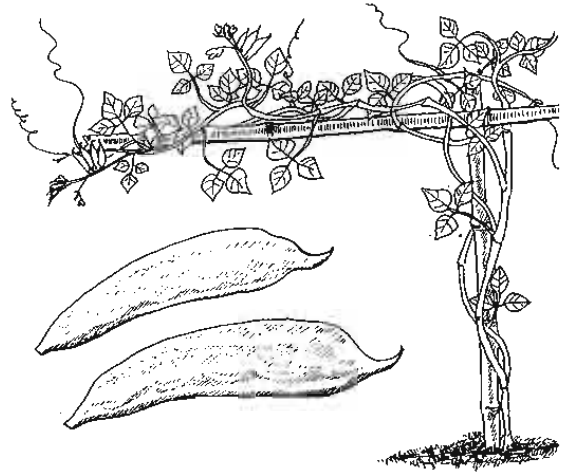
শিম বাংলাদেশের একটি অন্যতম শীতকালীন সবজি। শিমে প্রচুর পরিমাণে আমিষ থাকে। সব ধরনের মাটিতে শিমের চাষ করা যায়। তবে দোঁরাশ মাটিতে শিমের চাষ সবচেয়ে ভাল হয়।

### জাত

বারিশিম-১, বারিশিম-২, ঘৃতকাঞ্চন, কার্তিকা, নলডক, বাঘনখা, বারমাসি প্রভৃতি শিমের জনপ্রিয় জাত।

### মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ

বসতবাড়ির আশেপাশে, পুকুর পাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে সাধারণত শিমের চাষ করা হয়। মাদা ৪৫ সেমি. x ৪৫ সেমি. x ৪৫ সেমি. আকারে তৈরি করতে হবে। তারপর পচা আবর্জনা দিয়ে গর্ত পূরণ করতে হবে। গর্তে ১৮০ গ্রাম খৈল গুঁড়া, ১.৫ কেজি ছাই, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ৫০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গর্তটি এমনভাবে ভরতে হবে যেন ভূমি থেকে ভরাটকৃত গর্তের মাটির উচ্চতা ১০ সেমি হয়। একে মাদা বলে। সার প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর প্রতি মাদায় ৫-৬টি বীজ রোপণ করতে হবে। চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় ২টি সবল চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।



শিম

### পরিচর্যা

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা হিসেবে আগাছা দমন, পোকা দমন, পানি সেচ বা নিকাশ ও মাচার ব্যবস্থা করা দরকার।

### ফসল সংগ্রহ

সবজি হিসেবে বীজ শক্ত হবার আগেই শিম সংগ্রহ করতে হবে। শিমের বীজও ভাল সবজি। তাই বীজ শক্ত হলেও সংগ্রহ করা যায়।

### ব্যবহারিক

#### বিষয় : পুঁইশাক চাষ

পুঁইশাক দুইভাবে চাষ করা যেতে পারে। যেমন-

ক. সরাসরি জমিতে চাষ

খ. টবে বা কোন পাত্রে চাষ

কর্ম-৪ কৃষি-৬ষ্ঠ

## ক. জমিতে পুঁইশাকের চাষ

### উপকরণ

- ১। পুঁইশাকের ভালো জাতের বীজ
- ২। জমি তৈরির যন্ত্রপাতি যেমন-লাঙল, কোদাল ও নিড়ানি
- ৩। কমপোস্ট, পচা গোবর ও রাসায়নিক সার
- ৪। পানি দেওয়ার বাঁঝরি

### কাজের ধাপ

- ১। বইয়ে পুঁইশাকের চাষ দেওয়া আছে তা ভালোভাবে পড়ে নাও।
- ২। পুঁইশাকের ভালো বীজ সংগ্রহ কর।
- ৩। পুঁইশাক চাষের জন্য এক খণ্ড জমি বেছে নাও ও নামফলক লাগাও।
- ৪। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ঢেলা ভেঙে ঝুরঝুরে করে তৈরি কর।
- ৫। পরিমাণমত সার সংগ্রহ কর।
- ৬। অনুমোদিত সার জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে মিশিয়ে দাও ও বাকি সার রেখে দাও।
- ৭। সারি করে বীজ বপন কর।
- ৮। বীজ গজানোর পর পানি সেচ, নিড়ানি, সার উপরি প্রয়োগ কর এবং পোকা দমন কর।
- ৯। লক্ষ্য ডগা সংগ্রহ কর এবং ওজন করে পরিমাণ লিখে রাখ।
- ১০। এবার ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় পুঁইশাকের চাষ লেখ।

## বিষয় : টবে বা পাত্রে পুঁইশাকের চাষ

### উপকরণ

- ১। পুঁইশাকের ভালো বীজ।
- ২। মাটির চাড়ি বা বড় টব (টবের আকার ৪৫ X ৪৫ X ২৫ ঘনসেমি.)
- ৩। উর্বর মাটি।
- ৪। কমপোস্ট, পচা গোবর ও রাসায়নিক সার।
- ৫। পানি দেওয়ার বাঁঝরি।

### কাজের ধাপ

- ১। ভালো বীজ সংগ্রহ কর।
- ২। নির্বাচিত পাত্রের তলায় অবশ্যই একটা ছিদ্র থাকতে হবে। ছিদ্র ইটের খোয়া বা পাতিলের টুকরা দিয়ে পূরণ করে তার উপর গাছের কিছু শূকনা পাতা দাও। তারপর মাটি, কমপোস্ট বা পচা গোবর ও পরিমাণমত রাসায়নিক সার দিয়ে ভর্তি কর।
- ৩। পাত্রের উপরিভাগের মাটি সমান কর। তারপর সারি করে বীজ বপন কর। দরকার হলে হালকা সেচ দাও।
- ৪। আলো ও বাতাস পায় এমন নিরাপদ স্থানে পাত্রটি রাখ।
- ৫। প্রত্যেক দিন পাত্রটির গাছের অবস্থা দেখ। দরকার হলে পানি সেচ, নিড়ানি ও সার দাও।
- ৬। পাত্রে নামফলক লাগাও।
- ৭। প্রায় এক মাস বয়স হলে পুঁইয়ের ডগাগুলো কেটে নাও এবং ওজন করে লিখে রাখ।
- ৮। এবার ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে কাজগুলো লেখ। তোমার কিছু লক্ষণীয় থাকলে তাও লিখে রাখ।

## বিষয় : টমেটো বা বেগুনের চাষ

পুঁইশাকের মত টমেটো বা বেগুনও জমিতে বা কোন পাত্রে চাষ করা যায়।

### ক. জমিতে টমেটোর চাষ

#### উপকরণ

- ১। এক খণ্ড জমি।
- ২। যে কোন অনুমোদিত জাতের প্রয়োজনমত ভাল বীজ।
- ৩। জমি চাষের যন্ত্রপাতি যেমন লাঙল, কোদাল, নিড়ানি।
- ৪। কমপোস্ট, পচা গোবর ও রাসায়নিক সার।
- ৫। ঝাঁঝরি।

### বীজতলায় চারা উৎপাদন

#### কাজের ধাপ

- ১। প্রয়োজনমত আকারের জমি কাঠি দিয়ে চিহ্নিত করে নাও। সাধারণত ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১ মিটার প্রস্থ আকারের বীজতলা তৈরি কর।
- ২। বীজতলার মাটি কুপিয়ে ও ঢেলা ভেঙে বুরবুরে করে নাও।
- ৩। এবার বীজতলায় সমপরিমাণ বালি ও কমপোস্ট দিয়ে ৬ সেমি উঁচু করে নাও।
- ৪। ৩ মিটার x ১ মিটার আকারের একটি বীজতলায় ১০ গ্রাম বীজ বপন করতে হয়। বীজতলার আকার মোতাবেক বীজ মেপে নিয়ে তা বপন কর।
- ৫। দরকারমত পানি সেচ ও নিড়ানি দাও।
- ৬। চারার বয়স ৮-১০ দিন হলে চারাগুলো তুলে একইভাবে তৈরি করা দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণ কর।
- ৭। প্রত্যেক দিন বীজতলা দেখ এবং পানি সেচ ও নিড়ানি দাও।
- ৮। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে রোপণের জন্য গোড়ার মাটিসহ তুলে নাও।

### মূল জমিতে টমেটোর চাষ

#### কাজের ধাপ

- ১। বইয়ের টমেটোর চাষ ভালোভাবে পড়ে নাও।
- ২। উঁচু বা মাঝারি উঁচু, উর্বর দোআঁশ মাটি নির্বাচন কর।
- ৩। মাটি ৪-৫ বার চাষ মই দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ও ঢেলা ভেঙে বুরবুরে করে তৈরি কর।
- ৪। বইয়ে দেওয়া তাত্ত্বিক পাঠের ভিত্তিতে সার মেপে নিয়ে ব্যবহার কর।
- ৫। এবার ১ মিটার প্রস্থ, ৩০ সেমি উঁচু, পরিমাণমত লম্বা আকারের ভেলি তৈরি কর। দুই ভেলির মাঝে ৫০ সেমি. নালা রাখ এবং নালার মাটি তুলে ভেলিতে দাও।
- ৬। ভেলিতে সারি হতে সারি ৬০ সেমি. ও গাছ হতে গাছ ৪০ সেমি. দূরত্বে চারা রোপণ কর।
- ৭। সব সময় জমি আগাছা মুক্ত রাখ ও প্রয়োজনমত পানি সেচ দাও।
- ৮। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির সার যথাক্রমে চারা রোপণের তিন সপ্তাহ পর ও পাঁচ সপ্তাহ পর পার্শ্ব প্রয়োগ কর। এ সময় গাছের পার্শ্ব কুঁশি ছাঁটাই করে দাও। সার প্রয়োগের পর সেচ ও নিড়ানি দিয়ে সব সময় মাটি আলগা রাখ।



৯। টমেটোর বেলায় ইথেরিজি 'A' এর মত বাঁশের কাঠামো তৈরি করে দাও।

১০। রোগ ও পোকা দমনের জন্য শিক্ষকের পরামর্শমত ব্যবস্থা নাও।

১১। চারা রোপণের দুই মাস পর হতে ফসল সংগ্রহ শুরু কর। ফল সংগ্রহ করে ওজন করে লিখে রাখ।

১২। এবার ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

খ. টবে বা পাত্রে টমেটো অথবা বেগুনের চাষ জমিতে তৈরি বীজতলার পরিবর্তে একই নিয়মে টবে বা পাত্রে চারা উৎপাদন করা যায়।

### উপকরণ

১। একটি ২৫-৩০ সেমি. ব্যাসের টব বা পাত্র

২। কমপোস্ট ও বেলে মাটি

৩। পরিমাণমত বীজ

৪। পানি সেচ দেওয়ার বাঁঝারি

### টবে চারা উৎপাদন

#### কাজের ধাপ

১। টবে বা পাত্রে কমপোস্ট ও বেলে মাটি সমপরিমাণে মিশিয়ে ভরাট কর।

২। পাত্রের উপরিভাগের মাটি সমান কর। তারপর পরিমাণমত বীজ মাটির উপর সারি করে সাজিয়ে রাখ।

৩। এবার বীজ ১ সেমি. পরিমাণ বুরবুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দাও।

৪। হালকা পানি সেচ দাও।

৫। প্রত্যেক দিন গাছ দেখ ও পানি সেচ দাও। এভাবে ৩০-৩৫ দিন পর চারাগুলো রোপণের উপযোগী হবে।

### টবে বা পাত্রে ফসলের চাষ

১। মাটির টব, চাড়ি বা বড় টব উর্বর দোআঁশ মাটি ও কমপোস্ট দিয়ে ভর্তি কর।

২। একটি মাঝারি আকারের টবের মাটিতে চা চামচের দুই চামচ করে ইউরিয়া, টিএসপি ও পটাশ সার মিশিয়ে দাও।

৩। এরপর একটি চারা রোপণ কর।

৪। টবটি দিনের বেশিরভাগ সময় রোদ পায় এমন নিরাপদ জায়গায় রাখ।

৫। দরকারমত পানি সেচ দাও।

৬। প্রত্যেক দিন চারার অবস্থা দেখ ও দরকারমত পানি সেচ দাও।

৭। রোগ বা পোকাকার আক্রমণ হলে শিক্ষকের পরামর্শমত ব্যবস্থা নাও।

৮। দুই মাস পর হতে ফল সংগ্রহ শুরু কর। ফল সংগ্রহ করে ওজন করে লিখে রাখ।

৯। এবার কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. টমেটোর জাত কোনটি ?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. হীরণ  | খ. কিরণ   |
| গ. মানিক | ঘ. জুয়েল |

২. সবজি চাষে গোবর সার ব্যবহারের সুবিধা হল এটি -

- দামে সস্তা
- সহজলভ্য
- পরিবেশ সহায়ক

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিয়াজ তার বাড়ির এক খন্ড জমিতে মিষ্টকুমড়ার চাষ করেন। কুমড়া গাছগুলোতে ফুল ফোটা শুরু করলে রিয়াজ প্রতিদিন সকালে পুরুষ ফুলের পরাগরেণু নিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে বুলিয়ে দেন এবং পাশাপাশি অন্যান্য পরিচর্যাও করতে থাকেন। এভাবে উৎপন্ন কুমড়া নিজেরা নিয়মিত খান এবং প্রতিবেশীদেরও বিলিয়ে দেন।

৩. রিয়াজ পুরুষ ফুলের পরাগরেণু নিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে বুলিয়ে দিলো কেন ?

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ক. কুমড়ার ফলন বেশি হওয়ার জন্য | খ. কুমড়া আকারে বড় হওয়ার জন্য       |
| গ. কুমড়ার জাত ঠিক রাখার জন্য   | ঘ. কুমড়ার পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করার জন্য |

৪. নিয়মিত কুমড়া খাওয়ায় রিয়াজের পরিবারের কোন রোগটি প্রতিরোধ হতে পারে ?

- স্কার্ভি
- রিকেট
- রাতকানা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |       |            |
|-------|------------|
| ক. i  | খ. iii     |
| গ. ii | ঘ. i ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

গ্রীষ্মের ছুটিতে মামার বাড়িতে গিয়ে আফজাল দেখল মামা শফিক বেগুন চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করছেন। আফজাল লক্ষ করল যে, শফিক বেগুন চাষের জন্য দোআঁশ মাটির ২০ বর্গ মিটারের এক খন্ড জমি বেছে নিয়েছেন। প্রতিবেশী কয়েকজন বেগুন চাষীর বেগুন গত বছর পোকায় আক্রান্ত হওয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন বলে তিনি বেশ শঙ্কিতও রয়েছেন।

- বেগুনের একটি জাতের নাম লেখ ?
- শফিক বেগুন চাষের জন্য দোআঁশ মাটি বেছে নিলেন কেন ?
- শফিকের জমিটিতে বেগুন চাষের জন্য বিভিন্ন প্রকার সারের পরিমাণ কত হবে তা দেখাও।
- পোকায় আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে শফিক সাহেব কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন তা ব্যাখ্যা কর।

## তৃতীয় অধ্যায়

### বনায়ন

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### বনের পরিচিতি

বন বলতে আমরা প্রধানত নানা রকম উঁচু বড় বড় গাছপালায় ঢাকা এলাকাকে বুঝি। তবে সেখানে ছোট ছোট গাছপালা, অন্যান্য ছোট বড় বন্য জীবজন্তু এবং হাজারও রকম পোকামাকড় থাকবে। অন্যদিকে কোনো এলাকায় শুধু ছোট ছোট গাছপালা এবং বন্য জীবজন্তু আছে কিন্তু কাষ্ঠল গাছপালা নেই, সেই এলাকাকে বন বলা হয় না। এছাড়া বনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বন একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে থাকবে। বাংলাদেশে সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া এলাকায়, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও রংপুরের সমতল এলাকায় এবং খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার উপকূল এলাকায় প্রাকৃতিক বন দেখা যায়। গ্রামের বাড়িঘরের আঙিনায় যে উঁচু, কাষ্ঠল গাছপালা দেখা যায় তাকে প্রকৃত অর্থে বন বলা যায় না। এ প্রকার গাছপালাকে গ্রামীণ গাছপালা বলা হয়ে থাকে। অনেকে এই প্রকার স্থানকে গ্রামীণ বনও বলে। কৃষি জমি, হাট-বাজার, শহর-বন্দর কিংবা বসতবাড়ি গড়ার জন্য সব সুন্দর গ্রামীণ বন ধ্বংস করা হয়েছে।

#### বনের প্রকারভেদ

বনকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। যথা—

১। স্থান, ২। ভূমির উচ্চতা, ৩। জলবায়ু এবং ৪। উৎপত্তির ধরন কিংবা প্রধান প্রধান বৃক্ষের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বন ভাগ করা যায়। উৎপত্তির ভিত্তিতে বনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

ক. প্রাকৃতিক বন ও খ. মানুষের তৈরি বন।

#### ক. প্রাকৃতিক বন

যে বন প্রকৃতির নিয়মে গড়ে উঠেছে তাকে প্রাকৃতিক বন বলা হয়। পৃথিবীর সব বনাঞ্চলই মূলত প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক বনে বিভিন্ন রকমের গাছপালা ও বন্যপ্রাণী দেখা যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, রংপুর ও খুলনার উপকূলীয় এলাকায় যেসব বন দেখা যায়, তা প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠেছে। এলাকার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) পাহাড়ী বন, (২) সমতল ভূমির বন ও (৩) উপকূলীয় বন।

#### পাহাড়ী বন

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের পাহাড়িয়া এলাকায় যে প্রাকৃতিক বন দেখা যায় তাকে পাহাড়ী বন বলা হয়। গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, শিল, কড়ই ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষ পাহাড়ী বনে পাওয়া যায়। এই বনে হাতি, হরিণ, বানর, শূকর, চিতাবাঘ, ভল্লুক, হনুমান, বনমোরগ, বনমুরগি, অজগর সাপ ইত্যাদি বন্যপ্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ী বন থেকে চুইয়ে পড়া পানিতেই নদীগুলোর পানি প্রবাহ বজায় থাকে। কৃষকরা এই পানি ব্যবহার করে শীতকালীন ফসল ফলায়। এই পানি প্রবাহের ফলে নদীর নাব্যতা বজায় থাকে।

#### সমতল ভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহীর সমতল এলাকায় যে বন দেখা যায় তাকে সমতল ভূমির বন বলা হয়। এই বনের প্রধান গাছ হল শাল। তাই এই বনকে শালবনও বলা হয়। আজ সমতল ভূমির বন

বিলুপ্তির পথে। প্রধানত জনসংখ্যা বাড়ার ফলে বাড়তি কৃষিজমি, জ্বালানি ও বসতবাড়ির চাহিদা মেটাতে বন ধ্বংস হয়েছে। সরকার বনের ধ্বংস রোধে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ বনে শাল ছাড়াও চাপালিশ, কড়ই, হরিতকি প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। ঘরের খুঁটির জন্য শাল গাছ ভাল। এছাড়া বন হতে জ্বালানি কাঠ সরবরাহ পাওয়া যায়। বনে এখন বানর, বন্যশূকর ও কিছু পাখি ছাড়া আর কোনো বন্য প্রাণী দেখা যায় না।

### উপকূলীয় বন

বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা সহ দক্ষিণাঞ্চলের সমগ্র উপকূলব্যাপী লোনা পানিতে যে বন দেখা যায় তাকে উপকূলীয় বন বলা হয়। এই উপকূলীয় বন সুন্দরবন নামে পরিচিত। সুন্দরী এই বনের প্রধান গাছ। এরই নামে বনের নাম সুন্দরবন। এই বন দুইটি কারণে পৃথিবী খ্যাত। (১) সুন্দরবনই পৃথিবীর বৃহত্তম উপকূলীয় বন। (২) বনের অনন্য সুন্দর রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

সুন্দরবন আমাদের গর্বের বস্তু। সুন্দরবনে সুন্দরী ছাড়াও গেওয়া, পশুর, বাইন, কেওড়া, গোলপাতা ইত্যাদি বৃক্ষ পাওয়া যায়। গেওয়া নিউজপ্রিন্ট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। গোলপাতা ঘরের চাল তৈরিতে ব্যবহার হয়। সুন্দরী ও গরান থেকে গৃহনির্মাণ সামগ্রী এবং জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়। বনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও চিত্রাহরিণ, বানর, বন্যশূকর ও পাখি রয়েছে। পানিতে কুমির ও কাছিম দেখা যায়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রাহরিণ এবং এই বনের অনন্য সাধারণ নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিবছর অনেক দেশি-বিদেশি পর্যটক এখানে বেড়াতে আসে।

### খ. মানুষের তৈরি বন

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বনকে প্রাকৃতিক বন ও মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বনকে মানুষের তৈরি বন বা বন বাগান বলা হয়। পটুয়াখালি, নোয়াখালি, ভোলা ও চট্টগ্রামের সাগর পাড়ে জেগে উঠা নতুন চরে প্রায় ১.৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে উপকূলীয় বন সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকার বন পৃথিবীর প্রথম ও বৃহত্তম তৈরি বন। কেওড়া ও বাইন এই বনের প্রধান গাছ। এই বন নতুন জেগে উঠা চরকে সাগরের ভাঙন থেকে রক্ষা করে। এই বন চর এলাকার অধিবাসীদের জলোচ্ছাস ও সাইক্লোনের কবল থেকে রক্ষা করে। এছাড়া এই বন বন্যপ্রাণীর জন্য নতুন আবাসস্থল সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে এই বনে হরিণ, বানর ও পাখি দেখা যায়।

### বনের প্রয়োজনীয়তা

আর্থিক উন্নয়নে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের অবদান অনেক। বন থেকে আমরা যে মূল্যবান কাঠ পাই তা ঘরবাড়ি নির্মাণ, আসবাবপত্র ও কৃষি উপকরণ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এই বনের কাঠ থেকেই নিউজপ্রিন্ট, হার্ডবোর্ড, দিয়াশলাই ইত্যাদি নানা রকম কাঠজাত শিল্প সামগ্রী তৈরি করা হয়। বনের বাঁশ, বেত ও মূর্তা কুটির শিল্পে ব্যবহার করে নানা রকম সুন্দর সুন্দর সৌখিন সামগ্রী তৈরি করা হয়। এসব সৌখিন সামগ্রী দেশে ও বিদেশে কদর পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ দিয়ে কর্ণফুলী পেপার মিলে কাগজ তৈরি করা হয়।

জীবনরক্ষাকারী অনেক ঔষুধের কাঁচামাল বন থেকে সংগ্রহ করা হয়। গ্রামীণ স্বাস্থ্যরক্ষায় বনজ ঔষুধ এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা অনেক। সবুজ গাছ থেকেই আমরা অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পেয়ে থাকি। বন্যা, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, ভূমিকম্প ও অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বন আমাদের রক্ষা করে। এ বনই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজন্তু, পাখি ও কীটপতঙ্গের আবাসস্থল। বন ও পরিবেশবিজ্ঞানীগণের মতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশের আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বন থাকা প্রয়োজন।

## বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা

বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা আজ সারা পৃথিবী জুড়ে জোরালোভাবে আলোচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। এই দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বাধিক। এছাড়া জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত হারে। ফলে বসতভিটা, কৃষিজমি ও বনজ দ্রব্যের চাহিদার জন্য বন কেটে পরিষ্কার করা হচ্ছে। বনজ দ্রব্যের চাহিদা মিটাতে গাছ নির্বিচারে কাটা হচ্ছে। কিন্তু সে হারে বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে না। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বাড়ছে। সে জন্য আমাদেরকে অধিক হারে বৃক্ষ রোপণ ও তার যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে।

## ব্যবহারিক

### বিষয় : বন এলাকা পরিদর্শন

উপকরণ : ১. খাতা ২. কলম

### কাজের ধাপ

১. শিক্ষককে সাথে নিয়ে বন এলাকায় যাও।
২. বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষের সাথে পরিচিত হও। বৃক্ষের নাম বৈশিষ্ট্যসহ খাতায় লেখ।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের আয়তনের শতকরা কত ভাগ বন থাকা প্রয়োজন ?  
 ক. ১৫ খ. ২৫  
 গ. ৩৫ ঘ. ৪৫
২. সুন্দরবনের প্রধান গাছ কোনটি ?  
 ক. সুন্দরী খ. গেওয়া  
 গ. গোলপাতা ঘ. কেওড়া
৩. বনের ধ্বংস রোধে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে—  
 i সামাজিক বনায়ন করা  
 ii বনায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করা  
 iii বৃক্ষ না কাটা

### নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |            |
|-------------|------------|
| ক. i        | খ. i ও ii  |
| গ. ii ও iii | ঘ. i ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আসিফ ভোলায় এক নতুন চরে বসবাস করে। কিন্তু প্রতি বছর সাগরের ভাঙানে তাদের জমি ও বাড়িঘর বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

৪. আসিফের জমির ভাঙান রোধে কোন পদক্ষেপটি অধিক গ্রহণযোগ্য ?
- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ক. উপকূলীয় বনায়ন | খ. বাঁধ নির্মাণ   |
| গ. মাটি ভরাট       | ঘ. গ্রামীণ বনায়ন |
৫. আসিফ তার এলাকায় বন সৃষ্টিতে কোন গাছগুলো রোপণ করবে ?
- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ক. সুন্দরী ও গেওয়া | খ. পশুর ও গোলপাতা  |
| গ. কেওড়া ও বাইন    | ঘ. গর্জন ও চাপালিশ |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী রুমানা ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা ইত্যাদি এলাকায় উপকূলীয় বনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেখে কষ্ট পেল। তার বন কর্মকর্তা পিতা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে কীভাবে পাহাড়ি বন ও উপকূলীয় বন আমাদের রক্ষা করতে পারে এ বিষয়টি তাকে বললেন।

- ক. উপকূলীয় বন কী ?
- খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি কারণ বর্ণনা কর ?
- গ. পাহাড়ি বন নদীর নাব্যতা বজায় রাখতে কীভাবে সহযোগিতা করে তা বর্ণনা কর।
- ঘ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাসকরণে খুলনা ও বাগেরহাট এলাকার উপকূলীয় বনভূমির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# নার্সারিতে চারা তৈরি

### নার্সারি

যে জায়গায় যত্ন সহকারে পরিচর্যার মাধ্যমে গাছের চারা উৎপাদন করা হয় তাকে নার্সারি বলে। একটি সুন্দর নার্সারি হতে সতেজ ও সুন্দর চারা পাওয়া যায়। একটি সতেজ ও সুন্দর চারা রোপণের মাধ্যমে একটি সুন্দর গাছ পেতে পারি। তাই বন বাগান ও বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে নার্সারির ভূমিকা অনেক। চারা উৎপাদনের ভিত্তিতে নার্সারিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১। পলিব্যাগ নার্সারি

২। বেড নার্সারি

পলিব্যাগ নার্সারিতে চারা পলিব্যাগে আর বেড নার্সারিতে চারা সরাসরি নার্সারি বেডে উৎপাদন করা হয়। পলিব্যাগ নার্সারিতে চারা উৎপাদনে অনেক সুবিধা থাকায় বেশিরভাগ বনজ চারাই পলিব্যাগে উৎপাদন করা হয়। পলিব্যাগ নার্সারিতে চারা উৎপাদন করার প্রধান সুবিধাগুলো হল—

(১) পলিব্যাগে চারা রোপণ করা সহজ।

(২) পলিব্যাগে উৎপাদিত চারার পরিচর্যা করা সহজ এবং চারা মরে কম।

(৩) পলিব্যাগে চারা পরিবহণ করা সহজতর এবং পরিবহণে চারার কোনো ক্ষতি হয় না।

### পলিব্যাগ নার্সারি

সহজ কথায় যে নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হয় তাকে পলিব্যাগ নার্সারি বলা হয়। নার্সারি তৈরি করার জন্য বীজ ও মাটি সংগ্রহ, বেড তৈরি, বীজ বপন এবং চারার পরিচর্যা ইত্যাদি কাজ করতে হয়। পলিব্যাগ নার্সারি তৈরি করার জন্য পলিব্যাগ সংগ্রহ এবং পলিব্যাগে মাটি ভর্তিকরণের কাজও করতে হয়।

### বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ভালো বীজ থেকে ভালো চারা পাওয়া যায়। তাই ভালো বীজ সংগ্রহ করা চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঝ বয়সের সতেজ, রোগমুক্ত গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ খুব যত্নসহকারে সংগ্রহ করতে হবে যেন কোনো রকম আঘাত না পায়। বীজ সংগ্রহের পর বীজ বাছাইকরণ খুবই প্রয়োজন। যেসব বীজ পুষ্ট, সতেজ সেগুলোই শুধু সংগ্রহ করতে হবে।

কোনো কোনো গাছের বীজ খুব বেশি সময় তাজা এবং সতেজ থাকে না, যেমন—শাল, গর্জন, তেলসুর ইত্যাদি। এসব বীজের ক্ষেত্রে, বীজ সংগ্রহের পর পরই বপন করতে হবে, তা না হলে বীজ অঙ্কুরিত হবে না। এই জাতীয় বীজ সংরক্ষণ করা যায় না। অন্যদিকে কিছু কিছু গাছের বীজ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করলে অনেক দিন পর্যন্ত পুষ্ট এবং সতেজ থাকে। যেমন—সেগুন, মেহগনি, কড়ই, লোহাকাঠ ইত্যাদি। বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজকে ভালোভাবে রোদে শুকাতে হবে। এরপর শুকান বীজপাত্রে রেখে পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করে দিতে হয়। এভাবে বীজ অনেক দিন রাখা যায়। তবে বীজগুলো মাঝে মাঝে রোদে শুকাতে হবে। কোনো বীজ এক বছরের বেশি সংরক্ষণ না করাই ভালো।

## মাটি সংগ্রহ

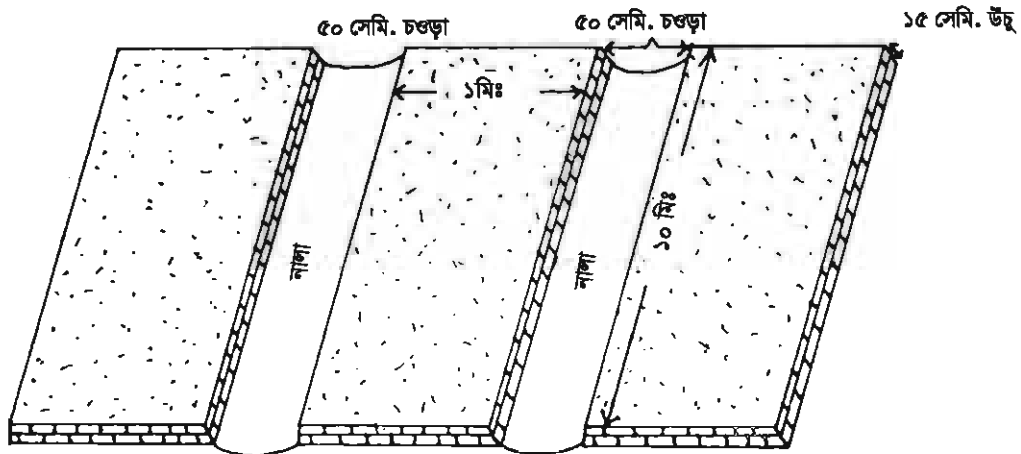
পলিব্যাগে চারা উৎপাদনে দোঁআঁশ মাটির প্রয়োজন। দোঁআঁশ মাটি শুকিয়ে শক্ত হবে না। এই জন্য মাটিতে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি বালি থাকতে হবে। সেজন্য মাটি সংগ্রহের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন বালির পরিমাণ ৫০-৬০ ভাগ থাকে।

## সার মিশানো ও মাটি তৈরি

মাটিতে সঠিক পরিমাণে পুষ্টি থাকলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। সাধারণভাবে ৩ ভাগ মাটির সঙ্গে ১ ভাগ জৈব সার, যেমন- পচা গোবর, পচাপাতা ও পচা খড়কুটো মেশাতে হবে। এই রকম মিশ্রিত মাটিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। তবে গোবরের অনুপাত কম হলে রাসায়নিক সার যেমন টিএসপি এবং এমপি মিশানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এলাকার বন বা কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। গোবর বা জৈব সার মিশ্রিত মাটি ১০-১৫ দিন স্তূপাকারে রেখে দিতে হবে। এর ফলে মাটির সঙ্গে গোবর ও সারের মিশ্রণ ভালো হবে। এই মিশ্রিত মাটি চালানি দিয়ে চেলে ইট পাথরের টুকরো এবং অন্যান্য আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। এভাবে তৈরি মাটি পলিব্যাগে ভর্তি করার উপযোগী হবে।

## নার্সারি বেড তৈরি

মাটি ভর্তি পলিব্যাগ রাখার জন্য বেড তৈরি করতে হয়। বেডের আকার ১০ মিটার X ১ মিটার। তবে নার্সারির আয়তন অনুসারে দৈর্ঘ্য কম বেশি হতে পারে। বেডগুলো ১০-১৫ সেমি. উঁচু করতে হবে। এতে বৃষ্টির পানি বেডের উপর দাঁড়াতে পারবে না। দুই বেডের মাঝখানে ৫০ সেমি. ফাঁকা রাখতে হবে। এর ফলে পরিচর্যা কাজ সহজ হয়। বেডের চারপাশ বাঁশ, কাঠ বা ইট দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যেন পলিব্যাগগুলো সোজা হয়ে বেডের উপর দাঁড়াতে পারে। বেডের ভিতরটা সমান ও শক্ত করতে হবে। বৃষ্টির পানি বের হবার জন্য বেডের চারদিকে নালা রাখতে হবে।

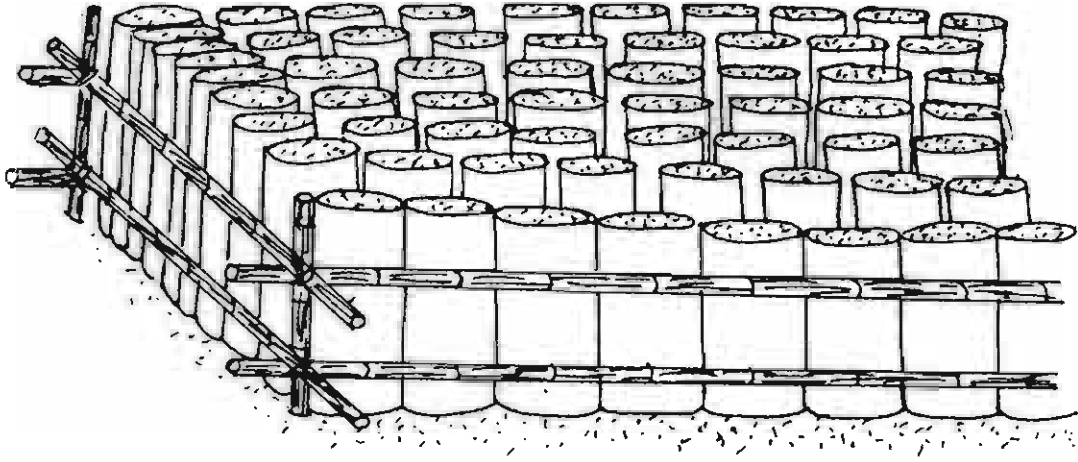


নার্সারি বেড

পলিব্যাগে চারা রাখার মেয়াদ এবং চারার বৃদ্ধির ওপর পলিব্যাগের আকার নির্ভর করে। চারা নার্সারিতে ১ বছর বা তার অধিক রাখতে হলে পলিব্যাগের আকার হবে ২৫ সেমি. X ১৫ সেমি.। অন্যদিকে চারা ১ বছরের কম রাখলে আকার হবে ১৫ সেমি. X ১০ সেমি.। পলিব্যাগের আকার বাড়লে পুরুত্বও বাড়াতে হবে। চারার বৃদ্ধি দ্রুত হলে পলিব্যাগের আকারও বড় হতে হবে। পলিব্যাগের চারপাশে সমান ব্যবধান রেখে ৮-১০টা ছিদ্র রাখতে হয়।



এই ছিদ্রপথে বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাবে। ছিদ্র না থাকলে এই অতিরিক্ত পানি পলিব্যাগে জমে চারার শিকড়ে পচন ধরায় এবং চারা মারা যেতে পারে।

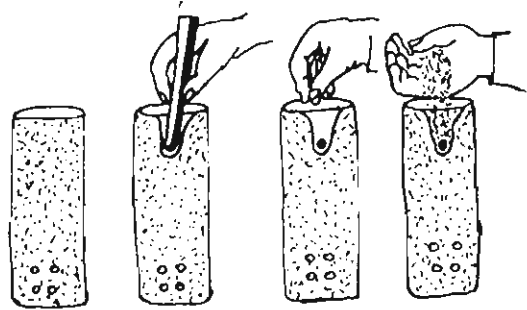


বেডে সাজানো মাটি ভর্তি পলিব্যাগ

উপরে বর্ণিত নিয়ম মেনে পলিব্যাগ নির্বাচন করতে হবে। পলিব্যাগ নির্বাচনের পর সার মিশানো মাটি পলিব্যাগে ভর্তি করতে হবে। সমতল ভূমিতে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে এমনভাবে মাটি ভর্তি করতে হবে যেন পলিব্যাগে কোনো রকম ফাঁকা জায়গা না থাকে। মাটি ভর্তি পলিব্যাগ বেডের এক পাশ থেকে সাজাতে হবে। বেডে সাজান পলিব্যাগ সোজা থাকবে এবং ব্যাগগুলোর মাঝখানে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকতে পারবে না।

### বীজ বপন

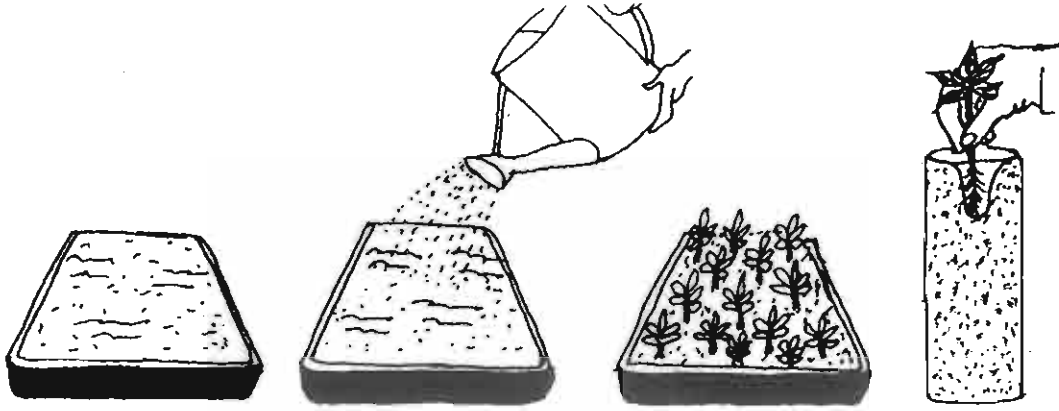
মাটি ভর্তি পলিব্যাগে একটি চ্যাপ্টা কাঠির সাহায্যে বীজের আকার অনুপাতে গর্ত করতে হবে। গর্তে বীজ রেখে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। একটি পলিব্যাগে কমপক্ষে দুইটি পুষ্ট ও সজীব বীজ দিতে হবে। বীজ খুব ছোট হলে সরাসরি পলিব্যাগে বপন না করাই ভাল। প্রথমে একটি বাগির ট্রেতে বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর নিয়মিত পানি দিতে হবে। বীজ গজানোর পর ২ বা ৩ জোড়া পাতা বের হলে, চারা তুলে নিয়ে পলিব্যাগে রোপণ করতে হবে। চিত্রে দেখান পদ্ধতিতে চারা রোপণ করতে হবে। চারার কাণ্ড ও শিকড় সোজা রেখে রোপণ করতে হবে। সবুজ কাণ্ড যেন মাটিতে ঢাকা না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।



পলিব্যাগে বীজ রোপণ

### চারার পরিচর্যা

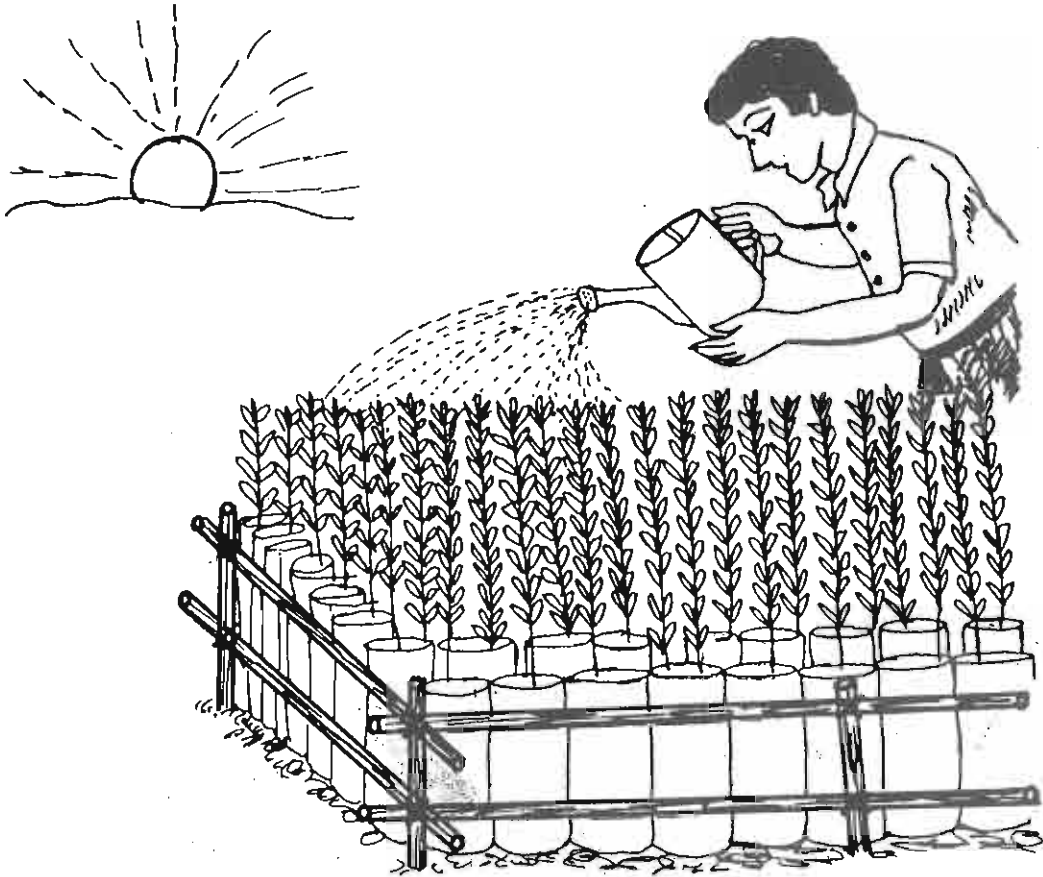
নার্সারিতে সতেজ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য চারার যথাযথ পরিচর্যার প্রয়োজন। সেচ, ছায়া ও বেড়া প্রদান, আগাছা পরিষ্কার, শিকড় ছাঁটাইকরণ ও রোগ দমন ইত্যাদি কাজ পরিচর্যার মধ্যে পড়ে। এসব পরিচর্যা যথাযথভাবে নেওয়া হলে সতেজ সবল চারা উৎপাদন করা সম্ভব।



ট্রেতে গজানো চারা পলিবাগে রোপণ

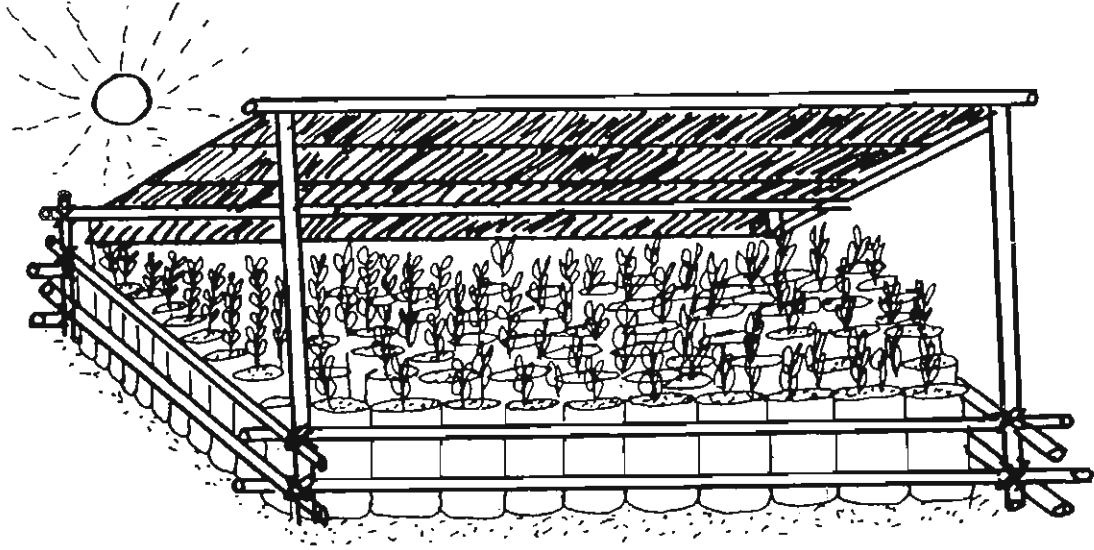
### সেচ ও ছায়া প্রদান

বীজ বপনের পর পলিবাগে সকাল বিকাল পানি দিতে হবে। ছোট চারা বেশি রোদ বা বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। সেজন্য বেডের উপর দুপুরে বা বৃষ্টির সময়ে শেড দেওয়া ভাল। চারা বড় হলে শেডের প্রয়োজন হয় না এবং সকাল



চারায় পানি সেচ

বিকালের পরিবর্তে শুধু বিকেলে সেচ দিলেই চলে। অবশ্য বৃষ্টি হলে সেচের কোনো প্রয়োজন নেই বরং বেশি পানি বেড থেকে নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।



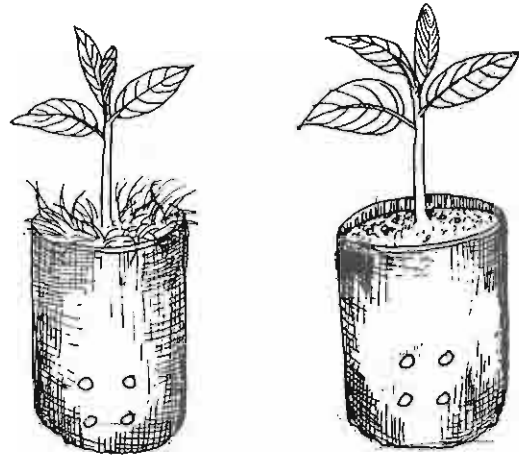
চারায় ছায়া প্রদান

### আগাছা পরিষ্কার করা

পলিবাগে আগাছা গজালে পরিষ্কার করে দিতে হবে। আগাছা থাকলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয় না। কারণ আগাছা পলিবাগের সীমিত পুষ্টির বিরাট অংশ শুষে নেয়। বেশি আগাছা চারাগাছকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

### শিকড় ছাঁটাইকরণ

চারা বড় হবার সাথে সাথে চারার শিকড়ও বড় হয়। পলিবাগে শিকড়ের স্থান সংকুলান হয় না।



আগাছামুক্ত পলিবাগে চারা

আগাছামুক্ত পলিবাগে চারা

ফলে শিকড় পলিবাগ ছেদ করে

বেরিয়ে আসে। এসব শিকড় মাঝে মাঝে কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে হয়। এছাড়া সব চারার বৃদ্ধি সমান হয় না। ফলে একই বেডে বড় এবং ছোট চারা মিশ্রভাবে থাকে। ছোট চারা আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হয়। এই ক্ষেত্রে উচ্চতা অনুসারে চারা বেডে সাজিয়ে দিলে সব চারাই সমান আলো বাতাস পাওয়ার সুযোগ পায় এবং বৃদ্ধি সুসম হয়।

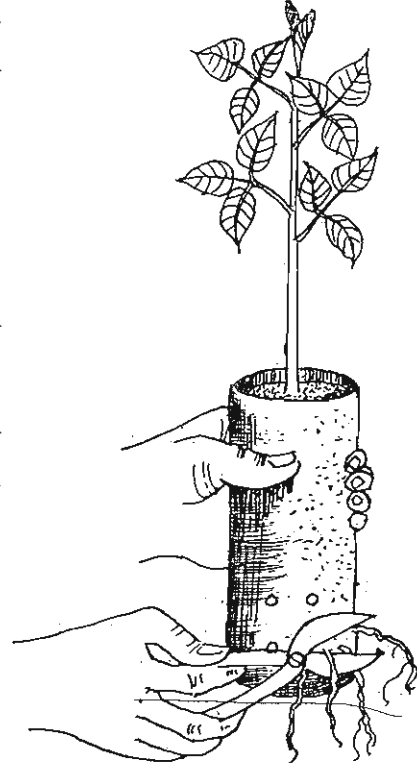
### পোকা ও রোগ দমন

চারায় পোকার আক্রমণ হলে পোকা দমনের ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সম্ভব হলে পোকা ধরে ধরে

মেয়ে ফেলাই উত্তম। চারায় কোন রোগের আক্রমণ ঘটলে স্থানীয় বন বা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর পরামর্শ গ্রহণ করে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

### বেড়া প্রদান

নার্সারিতে চারার বড় শত্রু হল গরু ছাগল। গরু ছাগলের উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নার্সারির চারদিকে বেড়া দেওয়া প্রয়োজন। হালকা বেড়া থাকলে রাতের বেলা গরু বেড়া ভেঙে নার্সারির চারা খেয়ে ফেলতে পারে। তাই নার্সারির বেড়ার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।



শিকড় ছাঁটাই

## ব্যবহারিক

বিষয় : পলিব্যাগে চারা তৈরি

### উপকরণ

বীজ, পলিব্যাগ, জৈব সার, ঝাঁঝরি, কাঁচি।

### কাজের ধাপ

- ১। বইয়ে পলিব্যাগে চারা তৈরি কীভাবে করতে হয় দেওয়া আছে তা ভালোভাবে পড়ে নাও।
- ২। ভালো বীজ সংগ্রহ কর।
- ৩। ৩ ভাগ মাটির সাথে ১ ভাগ জৈব সার মিশিয়ে ১০-১৫ দিন রেখে দাও।
- ৪। পলিব্যাগের চারপাশে সমান ব্যবধান রেখে ৮-১০টা ছিদ্র কর।
- ৫। কোনো রকম ফাঁক না রেখে পলিব্যাগে মাটি ভর।
- ৬। সোজা করে সারিবদ্ধভাবে বেড়ে পলিব্যাগ বসাও।
- ৭। একটি চ্যাপ্টা কাঠির সাহায্যে গর্ত করে বীজ বপন করে মাটি দিয়ে ঢেকে দাও।
- ৮। বীজ গজানোর পর পানিসেচ, আগাছা পরিষ্কার ও ছায়া প্রদান কর।
- ৯। চারা বড় হয়ে শিকড় পলিব্যাগের বাইরে চলে এলে কাঁচি দিয়ে কেটে দাও।
- ১০। এবার ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় চারা তৈরির ধাপগুলো লেখ।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. পলিব্যাগে চারা উৎপাদনের জন্য কোন মাটি সবচেয়ে ভালো ?

- |              |                |
|--------------|----------------|
| ক. বেলে মাটি | খ. ঐন্টেল মাটি |
| গ. পলি মাটি  | ঘ. দোআঁশ মাটি  |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাহীর গত বছর বেড়ে চারা তৈরি করলেও এ বছর সে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করল। কিছুদিন পর সে লক্ষ করল কিছু চারার ভালো বৃদ্ধি হলেও অনেক চারার বৃদ্ধি আশানুরূপ হয়নি।

২. এ অবস্থায় মাহীরের অবশ্য করণীয় কী ?

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| ক. শিকড় ছাঁটাইকরণ     | খ. চারাগুলো উচ্চতা অনুসারে সাজানো |
| গ. চারায় ছায়া প্রদান | ঘ. চারার পাতা ছাঁটাইকরণ           |

৩. মাহীর চারা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করল কেন ?

- পলিব্যাগে চারা রোপণ করা সহজ
- চারায় পানি কম দিতে হয়
- চারা কম মারা যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

সেলিম নার্সারিতে চারা উৎপাদনের জন্য কিছু সেগুন, মেহগনি ও কড়ই বীজ সংগ্রহ করে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করল। এক বছর পর বীজগুলো নার্সারিতে বপনের পর দেখতে পেল অধিকাংশ বীজ অঙ্কুরিত হয়নি। পরবর্তীতে সে কৃষি কর্মকর্তার নিকট থেকে বীজ সংরক্ষণের সঠিক পদ্ধতি জেনে নিল।

- নার্সারি কী ?
- অধিকাংশ বীজ অঙ্কুরিত না হওয়ার একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।
- সেলিমের সঠিক পদ্ধতি কীভাবে বীজ সংরক্ষণ করতে পারে বর্ণনা কর।
- ‘একমাত্র পুষ্ট ও সতেজ বীজ নার্সারিতে চারা তৈরির উপযোগী’—বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# বৃক্ষের চারা রোপণ ও যত্ন

বৃক্ষের চারা রোপণ সময় ও পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিচর্যা সম্পাদন করতে হয়। এতে চারা সবল হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে। এখানে এ সব পরিচর্যা বর্ণনা করা হল।

### চারা লাগানোর সময়

বছরের সব সময়ই গাছ লাগানো যায়। তবে বাংলাদেশে চারাগাছ লাগানোর সর্বোত্তম সময় জুন-জুলাই মাস। এই সময় মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হয়। মাটিতে প্রচুর পরিমাণে রস থাকে। এই সময় লাগালে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। চারা মরে যাবার আশঙ্কা কম থাকে।

### স্থান নির্বাচন ও গর্ত তৈরি

চারাগাছটির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত স্থানটি পরিষ্কার করতে হবে। সাধারণত প্রতিটি চারার জন্য ৫০ সেমি. X ৫০ সেমি. X ৫০ সেমি. গর্ত করতে হয়। পাশাপাশি লাইনে চারা লাগাতে হলে এক লাইন থেকে অন্য লাইনের ও এক গর্ত থেকে অন্য গর্তের দূরত্ব ৩ মিটার X ৩ মিটার হওয়া ভাল। চারা রোপণের ২০ থেকে ২৫ দিন পূর্বে গর্ত করতে হয়।

### গর্তে সার প্রয়োগ

গর্তের মাটির সাথে ১০-১২ কেজি পচা গোবর, ১৫ গ্রাম টিএসপি এবং ৪০ গ্রাম এমপি ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর এই মিশানো মাটি গর্তে ভরে ২০-২৫ দিন রেখে দিতে হবে।

### চারা রোপণ কৌশল

সার মিশানো মাটি ২০-২৫ দিন রাখার পর গর্তের মাটি চারা লাগানোর উপযোগী হবে। প্রথমে চারাটির আকারের সাথে মিল রেখে গর্তের মাঝখান থেকে মাটি সরাতে হবে। চাকু বা ব্লেডের সাহায্যে পলিব্যাগ কেটে চারা বের করতে হবে। এই পলিব্যাগ সরানোর কাজটি এমনভাবে করতে হবে যেন মাটি ভেঙে না পড়ে। এরপর চারাটিকে দুই হাত দিয়ে ধরে সরানো মাটির ফাঁকে সোজা করে বসিয়ে দিতে হবে। তারপর চারদিক থেকে সরানো মাটি চারার গোড়ায় চাপ দিয়ে শক্ত করে ঠেসে দিতে হবে যেন চারাটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছের গোড়ার মাটি একটু উঁচু থাকবে। তা না হলে চারার গোড়ায় পানি জমে শিকড়ে পঁচন ধরতে পারে এবং পরিণতিতে চারা মারা যেতে পারে।

### চারার যত্ন ও পরিচর্যা

রোপণ করা চারা থেকে পরিণত গাছ পাওয়ার বড় শর্ত হল চারার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। চারাগাছ বড়ই নাজুক থাকে। সামান্য প্রতিকূল অবস্থাও সহ্য করতে পারে না। তাই বেড়ে উঠার জন্য সযত্ন পরিচর্যার প্রয়োজন। চারাগাছের পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে বেড়া ও সহায়ক খুঁটি প্রদান, সার প্রয়োগ, পানি সেচ, আগাছা বাছাই ইত্যাদি।

### বেড়া ও সহায়ক খুঁটি প্রদান

আমাদের দেশে রোপণ করা চারাগাছের বড় শত্রু ছাগল ও গরু। এসব পশুর উপদ্রব হতে রক্ষার জন্য শক্ত বেড়া দিতে হবে। বেড়া বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। বেড়াটি যাতে নড়াচড়া করতে না পারে সেজন্য দুই পাশে দুইটি খুঁটি পুঁতে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় চারাগাছটি একটু বড় হলে লাগানোর পর চারাটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সেক্ষেত্রে একটি কঞ্চি পুঁতে তার সাথে দড়ি দিয়ে চারাটিকে বেঁধে দিতে হয়।

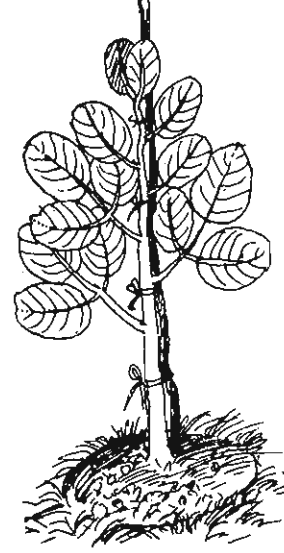
দড়ি দিয়ে বাঁধার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বাঁধনটি শক্ত না হয়। বাঁধনটি এমন হবে যে চারাটি হেলে পড়বে না অথচ বাতাসে সামান্য নড়বে।

### আগাছা বাছাই

আমাদের দেশে প্রচুর আগাছা জন্মায়। চারাগাছের গোড়ায় আগাছা জন্মালে তা নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করতে হবে। আগাছা মাটি থেকে পানি ও পুষ্টি শুষে নেয়। ফলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয় না। আমরা জানি শীতকালে মাটির রস কমে যায়। এ সময় চারার গোড়ার চারদিকে লতা-পাতা, খড়কুটা, কচুরিপানা ইত্যাদি বিছিয়ে দিলে মাটিতে রস অনেক দিন থাকে। এছাড়া খড়কুটা পঁচে মাটিতে জৈব পদার্থের যোগান দেয়। ফলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। শীতকালেও চারা সতেজ ও সবল থাকে। এইভাবে চারার গোড়ায় খড়কুটা ছড়িয়ে দেওয়াকে মালচিং বলা হয়।

### পানি সেচ

বর্ষার শুরুতেই চারা গাছ রোপণ করা উত্তম সময়। সাধারণত বর্ষায় পানি সেচের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যদি খরা দেখা দেয় তবে নিয়মিত পানি সেচ দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া শূষ্ক মৌসুমে মাটিতে রসের অভাব দেখা দিলে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। পানি সেচ সকালে বা বিকালে দিতে হয়।



চারা রোপণ ও খুঁটি প্রদান

## ব্যবহারিক

### বিষয় : বৃক্ষের চারা রোপণ

#### উপকরণ

বৃক্ষের চারা, গোবর সার, টিএসপি ও এমপি সার, বাঁঝরি।

#### কাজের ধাপ

- ১। চারা লাগানোর জন্য স্থান নির্বাচন কর।
- ২। প্রতিটি চারার জন্য সারি করে ৫০ সেমি. X ৫০ সেমি. X ৫০ সেমি. আকারের গর্ত কর।
- ৩। এক গর্ত থেকে আরেক গর্তের দূরত্ব ৩ মিটার করে রাখ।
- ৪। গর্তের মাটিতে ১০-১২ কেজি পচা গোবর, ১৫ গ্রাম টিএসপি এবং ৪০ গ্রাম এমপি ভাল করে মিশিয়ে দাও।
- ৫। ২০-২৫ দিন পর গর্তের মাঝখান থেকে মাটি সরিয়ে চাকু বা ব্লেন্ডের সাহায্যে পলিব্যাগ কেটে চারা বের করে গর্তে রোপণ কর।
- ৬। বেড়া বা সহায়ক খুঁটি প্রদান, পানি সেচ, আগাছা বাছাই ইত্যাদি করে চারার যত্ন নাও।
- ৭। এবার ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় চারা রোপণের ধাপগুলো লেখ।

ক. চারা রোপণের কত দিন পূর্বে গর্ত করতে হয় ?  
খ. বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল কেন ?  
গ. শীতের শুরুতে চারাগাছের গোড়ায় খড়কুটা দেয়ার কারণ বর্ণনা কর ।  
ঘ. কী ধরনের পদক্ষেপ নিলে ছাত্রদের দ্বারা চারাগাছ বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত? ব্যাখ্যা কর ।



## চতুর্থ অধ্যায়

# মাছ চাষ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### মাছ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে মাছ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশের আবহাওয়া, মাটি ও পানি মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

মাছ শীতল রক্ত বিশিষ্ট মেৰুদণ্ডী প্রাণী। এরা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। পাখনার সাহায্যে পানিতে চলাফেরা করে। মাছের মাথা ও লেজের দিক কিছুটা সরু। ফলে মাছ পানিতে দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। মাছের দেহের তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রার সাথে ওঠানামা করে।

বাংলাদেশে রয়েছে দীঘি, পুকুর, নদীনালা, বিল, হাওর, বাঁওড়, বিশাল সমুদ্র। এসব জায়গায় আগে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রচুর মাছ উৎপাদিত হত। মানুষ তার প্রয়োজনে মাছ ধরত, মাছের চাষ করত না। বর্তমানে মানুষের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে, বেশি করে মাছ ধরা হচ্ছে। তাই জলাশয়গুলো উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। বর্তমানে চাহিদার তুলনায় মাছের উৎপাদন অনেক কমে গেছে। পানি সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে, সেজন্য আধুনিক প্রযুক্তি, কলাকৌশল শেখা প্রয়োজন। মাছ চাষের সনাতন পদ্ধতির জায়গায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

### প্রয়োজনীয়তা

মাছ আমিষজাতীয় খাদ্য। তবে আমিষজাতীয় খাদ্য হলেও মাছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, খনিজ লবণ ও ভিটামিন আছে। এছাড়াও সামুদ্রিক মাছে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে।

মানুষের দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতির জন্য আমিষজাতীয় খাদ্য অত্যাবশ্যক। মাছ সহজে হজম হয়। মাছে ভিটামিন এ ও ডি আছে। মাছের ত্বকে অধিক পরিমাণে ভিটামিন ডি আছে। স্বাদু পানির মলা মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আছে। ভিটামিন এ'র অভাবে মানুষের রাতকানা রোগ হয়। মাছের কাঁটায় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ও খনিজ লবণ আছে। এর সব উপাদানই আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়।

### অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মাছ বা মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব খুব বেশি। এই সম্পদ গ্রামের লোকজনের কর্মসংস্থান করে। আবার মাছ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আসে। ১৯৯৬-৯৭ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ১৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। জাতীয় আয়ের ৫ ভাগ এবং কৃষি খাতের প্রায় ১৬.৭ ভাগ মৎস্য সম্পদের অবদান। রপ্তানি আয়েরও ৭-৯ ভাগ আসে মৎস্য খাত থেকে। তাছাড়া মোট পুষ্টি চাহিদার শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ পূরণ হয় এই খাত থেকে। ২০০৬-২০০৭ সালে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৪.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদে ইলিশ খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। অভ্যন্তরীণভাবে আহরিত মৎস্যের ৩০ ভাগ ইলিশ। এই বিরাট মৎস্য সম্পদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মৎস্যজীবী জড়িত। তারা ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রয় প্রভৃতি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

চিথড়ি উল্লেখযোগ্য মৎস্য সম্পদ। মৎস্য সম্পদ হতে রপ্তানি আয়ের ৯০ ভাগই আসে চিথড়ি থেকে। ইলিশের মত চিথড়ি আহরণ, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে প্রায় ৩ থেকে ৪ লাখ মৎস্যজীবী জড়িত রয়েছে।

### উৎস

বাংলাদেশের খাল, বিল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি মৎস্য সম্পদের উৎস। মৎস্য উৎপাদনের ভিত্তিতে উৎসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক. স্বাদু পানি, খ. নদীর মোহনা অঞ্চল এবং গ. সাগরের লোনা পানি।

### ক. স্বাদু পানির মৎস্য সম্পদ

নদীনালা, খালবিল, হাওর, বাঁগড়, পুকুর, দীঘি জাতীয় জলাশয়কে স্বাদু পানির জলাশয় বলা হয়। রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, কই, মাগুর, টেঙ্গা, পাবনা, ঘনিয়া, পুঁটি, চাপিলা, বাটা, চিতল, শোল, গজার, বোয়াল, পাঙ্গাস, আইড়, গলদা চিথড়ি, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প প্রভৃতি স্বাদু পানির মাছ।



### খ. নদীর মোহনা অঞ্চল মৎস্য সম্পদ

নদীর মোহনা অঞ্চলে যেসব মাছ পাওয়া যায়, সেগুলো হল ইলিশ, ভেটকি, লইট্যা প্রভৃতি।



### গ. সাগরের লোনা পানির মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বিরাট বঙ্গোপসাগর। এই সাগরই সামুদ্রিক মাছের উৎস হিসেবে পরিচিত।



কয়েকশ' রকমের মাছ এই উৎস থেকে পাওয়া যায়। এসব মাছের মধ্যে কেবল অল্প সংখ্যক প্রজাতির মাছ আমাদের খাওয়ার উপযোগী। রূপচাঁদা, লাক্ষা, ভেটকি, ছুরি, কোরাণ প্রভৃতি মাছ উল্লেখযোগ্য।

### মাছের দেহের অংশ পরিচিতি

মাছের দেহ বিভিন্ন অংশ দ্বারা গঠিত। নিচে মাছের দেহের প্রধান বাহ্যিক বা বাহিরের অংশগুলোর পরিচিতি দেওয়া হল :



### আইশ

আইশ মাছের দেহকে আবৃত করে রাখে এবং আঘাত থেকেও রক্ষা করে। বেশির ভাগ মাছের দেহ আইশ দ্বারা আবৃত। যেমন-রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প।

তাছাড়া মাছের দেহে পিচ্ছিল তরল পদার্থ মিউকাস থাকে। এই তরল পদার্থ মাছকে রোগ জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। মাছের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

### মুখ

মাথার অগ্রভাগে দুই চোয়ালের মাঝখানে একটা ছিদ্র আছে। এটাই মাছের মুখ। কোনো কোনো মাছের চোয়ালে দাঁত আছে। যেমন- শোল, বোয়াল। আবার কোনো মাছের দাঁত নেই। যেমন- রুই, কাতলা ও মৃগেল।

## চোখ

মাছের মাথার দুই পাশে দুইটি গোলাকার চোখ আছে। মাছের চোখের পাতা নেই। তাই মাছের সবসময় চোখ খোলা থাকে।

## কানকো

মাছের মাথার দুই পাশে শক্ত ঢাকনি দেখা যায়। এদের কানকো বলে। ফুলকাকে রক্ষা করাই কানকোর কাজ।

## লেজ

দেহের সবচেয়ে পিছনের অংশ লেজ। আরামে চলাফেরা এবং আত্মরক্ষার কাজে লেজ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া লেজ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।

## ফুলকা

ফুলকা দেখতে লাল চিরুনির মত, কানকোর নিচে থাকে। মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

## পাখনা

মাছের দেহের পিঠে, বুক ও লেজে পাখনা আছে। পাখনার সাহায্যে মাছ পানিতে চলাফেরা করে।

## পায়ুপথ

মাছের পেটের নিচে লেজের দিকে একটি ছিদ্র আছে, এটাই মাছের পায়ুপথ। এর সাহায্যে মাছ মলমূত্র ত্যাগ করে।

## চাষযোগ্য মাছের পরিচিতি

বাংলাদেশের স্বাদু পানিতে অনেক রকমের মাছ আছে। সব মাছ পুকুরে চাষের উপযোগী নয়। দেশি প্রজাতি ছাড়াও কিছু বিদেশি প্রজাতির মাছ এদেশে আনা হয়েছে। এসব মাছ আমাদের দেশি মাছের সাথে একত্রে পুকুরে চাষ করা যায়। সরপুঁটি, নাইলোটিকা, বিদেশি মাগুর পুকুরে চাষ করা যায়। বিদেশি মাগুর এককভাবে চাষ করা ভাল। কারণ এ মাছ অন্য মাছ খেয়ে ফেলে।

## চাষযোগ্য মাছের বৈশিষ্ট্য

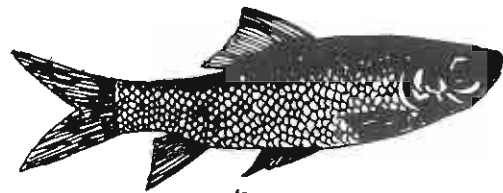
পুকুরে চাষের উপযোগী মাছের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যেমন—

- ১। খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়।
- ২। পুকুরের সকল স্তর থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।
- ৩। পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাদ্য খায়। যেমন অতি ক্ষুদ্র শেওলা বা উদ্ভিদ কণা, প্রাণিকণা এবং ছোট ছোট কীটপতঙ্গ।
- ৪। পোনা সহজে পাওয়া যায়।
- ৫। বাজারে প্রচুর চাহিদা আছে।
- ৬। বেশি সংখ্যায় পুকুরে ছাড়া যায়।
- ৭। খেতে সুস্বাদু।

বর্তমানে আমাদের দেশে দেশি ও বিদেশি কার্পজাতীয় মাছ একত্রে পুকুরে চাষ করা হয়। নিচে তাদের পরিচিতি দেওয়া হল :

## রুই

দেশি প্রজাতির কার্পজাতীয় মাছ। এটা স্বাদু পানির নদীর মাছ। তবে বন্দ্র জলাশয় বা পুকুরে চাষ করা যায়। এই মাছের মুখ মাথার অগ্রভাগে তাই পানির মধ্য স্তরের খাবার খায়। খেতে খুব সুস্বাদু। এই মাছের পেটের চেয়ে পিঠের তল বেশি



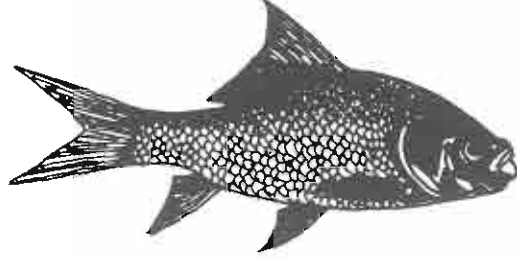
রুই মাছ

বাঁকানো। মাথা ত্রিকোণাকার এবং ছোট। পিঠের দিকের আঁইশের রং কিছুটা বাদামি। পেটের দিক হালকা সোনালি

রঙের। পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য প্রাণিকণা, শেওলা ইত্যাদি খায়। বাইরে থেকে দেওয়া খৈল, কুঁড়া ইত্যাদি খাবারও খায়। কৃত্রিম উপায়ে ডিম পাড়ানো যায়। সাধারণত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ডিম পাড়ে। রুই, কাতলার অনুপাতে কম বাড়ে। দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মিটারের মত লম্বা হয়। দশ মাসে খাওয়ার উপযোগী হয়।

### কাতলা

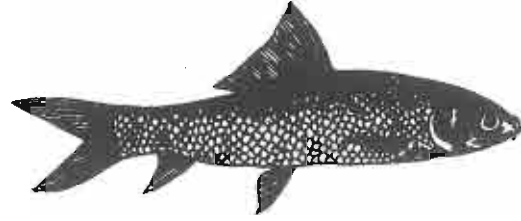
রুই মাছের মত কাতলা স্বাদু পানির মাছ। এ মাছ বন্দ্র জলাশয়ে চাষ করা যায়। কাতলার মাথা বড়, পিঠ উঁচু, দেহ চওড়া ও একটু চ্যাপটা। পিঠের আঁইশের রং হালকা ধূসর এবং পেটের রং সাদাটে। নদীতে বা বড় জলাশয়ে দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। সাধারণত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ডিম পাড়ে। কৃত্রিম উপায়েও ডিম পাড়ানো যায়। কাতলা পানির উপরের স্তরের খাবার খায়। তাই কাতলা মাছের মুখ উপরের দিকে। এ মাছ খেতে খুব সুস্বাদু।



কাতলা মাছ

### মৃগেল

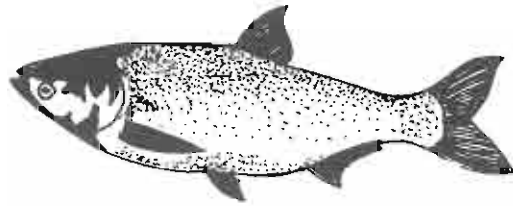
রুই কাতলার মত মৃগেলও নদীর মাছ। তবে পুকুরে চাষ করা যায়। এ মাছের পেট অপেক্ষা পিঠের তল সামান্য বাঁকানো। মাথা দেহের তুলনায় ছোট এর মুখ কিছুটা নিচের দিকে। তাই এই মাছ পুকুরের তলার খাবার খায়। মুখের দুই পাশে দুই জোড়া শঁড় আছে। পুকুর বা জলাশয়ের তলদেশে বাস করে। তলার পচা জৈব আবর্জনা ও কাদার মধ্যে জন্মানো কীটপতঙ্গ শেওলা এই মাছের খাদ্য। মৃগেল মাছ বাড়তি খাবারও খায়। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস মৃগেল মাছের ডিম পাড়ার সময়। দেশি কার্পজাতীয় মাছের সঙ্গে একত্রে চাষযোগ্য বিদেশি কার্পজাতীয় মাছের পরিচিতি নিচে দেওয়া হল।



মৃগেল মাছ

### সিলভার কার্প

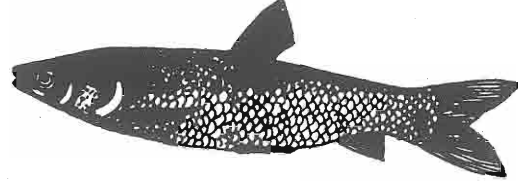
চীন, রাশিয়ায় সিলভার কার্প মাছের আদি বাস। নদীতে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ সিলভার কার্প ১৯৬৯ সালে প্রথম এদেশে আনা হয়। দেহ ছোট, রূপালি রঙের আঁইশ দ্বারা আবৃত। এই মাছ ছোট অবস্থায় চাপিলা এবং মাঝারি অবস্থায় দেখতে ইলিশের মত। দেহ দুই পাশে চ্যাপটা, মাথা ছোট। এই মাছ পানির উপরের স্তরে অবস্থিত উদ্ভিদকণা খায়। তবে বাইরে থেকে দেওয়া খাবারও খায়। এরা পুকুরের উপরের স্তরের খাবার খায়। বছরে দেড় হতে দুই কেজি ওজনের হয়। সিলভার কার্প, রুই, কাতলা ও মৃগেলের সাথে চাষ করা যায়।



সিলভার কার্প

### গ্রাস কার্প

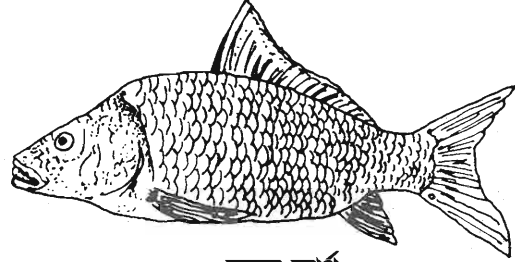
চীন ও রাশিয়ার নদীর মাছ। ১৯৬৬ সালে প্রথম বাংলাদেশে আনা হয়। অন্য মাছের সঙ্গে এদেশের পুকুরে চাষযোগ্য। মাথা বড়, মুখের উপরের চোয়াল নিচের চোয়াল থেকে সামান্য লম্বা। এই মাছের দেহ কিছুটা মৃগেলের মত। তবে পিঠের পাখনা ছোট। গায়ের রং ঈষৎ সবুজ। বড় হলে এই মাছ নরম জলজ আগাছা, ঘাস ও পাতা খায়। পুকুরের জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গ্রাসকার্প ছাড়া যায়।



গ্রাস কার্প

### কমন কার্প

১৯৭৯ সালে নেপাল থেকে কমন কার্প এদেশে আনা হয়। কমন কার্প আমাদের দেশে কার্পিও নামে পরিচিত। এই মাছ পুকুরের তলদেশে বাস করে। কমন কার্পের প্রজাতিভুক্ত একটি মাছ হল মিরর কার্প। মিরর কার্পের গায়ে আঁইশ খুব কম। দুই একটি সারিতে বড় বড় এলোমেলো আঁইশ থাকে।



কমন কার্প

### বিগহেড কার্প

১৯৮১ সালে নেপাল থেকে এই মাছ আনা হয়েছে। বিগহেড কার্প মাছ দ্রুত বর্ধনশীল। বছরে এই মাছ দুই কেজি ওজনের হতে পারে।

## ব্যবহারিক

বিষয় : মাছের প্রধান প্রধান বাহ্যিক অংশ পর্যবেক্ষণ

### (১) উপকরণ

১. একটি ছোট রুই মাছ ২. একটি ট্রে ৩. আতস কাচ

### কাজের ধাপ

- এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত মাছের প্রধান অংশগুলো দেখ।
- শিক্ষকের নিকট অংশগুলো ঠিকভাবে চিনতে শেখ।
- খাতায় একটি মাছের ছবি ঐক্যে অংশগুলোর নাম লেখ।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

- মাছ কিসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়?
 

ক. পাখনার সাহায্যে	খ. লেজের সাহায্যে
গ. ফুলকার সাহায্যে	ঘ. মাথার সাহায্যে
- মাছে আছে -
  - ভিটামিন এ ও বি
  - ভিটামিন এ ও সি
  - ভিটামিন এ ও ডি

নিচের কোনটি সঠিক?

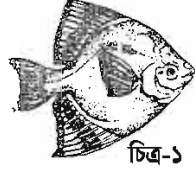
ক. i ও ii

গ. ii ও iii

খ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র দেখে ৩ - ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র-১



চিত্র-৩



চিত্র-২



চিত্র-৪

৩. উপরের কোন চিত্রটি সাগরের লোনা পানির মাছ?

ক. চিত্র : ১

গ. চিত্র : ৩

খ. চিত্র : ২

ঘ. চিত্র : ৪

৪. কোন মাছটি নিচের স্তরের খাবার গ্রহণ করে?

ক. চিত্র : ১

গ. চিত্র : ৩

খ. চিত্র : ২

ঘ. চিত্র : ৪

৫. স্বাদু পানির মাছ হল?

i. চিত্র : ১

ii. চিত্র : ২

iii. চিত্র : ৩

নিচের কোনটি সঠিক ?

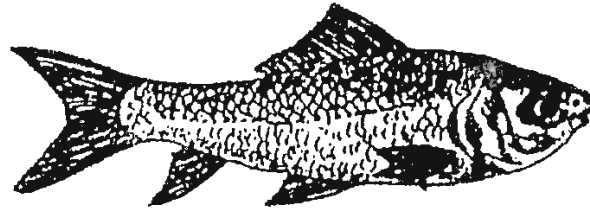
ক. i

গ. ii ও iii

খ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন



চিত্র

ক. ওপরের চিত্রটি কী ধরনের প্রাণীর?

খ. চিত্রে প্রদর্শিত মাছটি যে জাতের তার একটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রে প্রদর্শিত একই জাতের অন্য একটি মাছের ছবি এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই জাতীয় মাছ চাষের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### পুকুর

যে কোনো আকার বা আয়তনের জলাশয়ে মাছ চাষ করা যায়। আবার যেখানে প্রয়োজনীয় পানি থাকে সেখানেই মাছ চাষ করা যেতে পারে। পুকুরের পানির উপস্থিতি অনুযায়ী পুকুরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ক. স্থায়ী পুকুর ও খ. অস্থায়ী পুকুর বা মৌসুমি পুকুর।

**স্থায়ী পুকুর :** যে সমস্ত পুকুরে সারা বছর কমপক্ষে ১ মিটার পানি থাকে তাকে স্থায়ী পুকুর বলে। এ সমস্ত পুকুরে কার্পজাতীয় মাছের চাষ, গলদা-কার্প-মিশ্র চাষ লাভজনক। এই জাতীয় পুকুরে পোনা, বড় মাছ ও চিংড়ি চাষ করা যায়।

**অস্থায়ী বা মৌসুমি পুকুর :** যে সমস্ত পুকুরে বছরে তিন থেকে আট মাস পানি থাকে তাকে মৌসুমি পুকুর বলে। এসব পুকুরে পানির গভীরতা এক থেকে দেড় মিটার হতে পারে। নাইলোটিকা, সরপুটি, মাগুর এই জাতীয় মাছ পুকুরে চাষ করা লাভজনক। মাছের পোনা চাষ করার জন্য এসব পুকুর উপযোগী।

### মাছ চাষে ব্যবহার অনুযায়ী পুকুরের শ্রেণীবিভাগ

অন্যান্য প্রাণীর মত মাছেরও খাদ্য গ্রহণের স্বভাব, চাহিদা ও পরিবেশের পরিবর্তন প্রয়োজন। বিভিন্ন বয়সে এই তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। চাষাবাদ অবস্থায় রেণু থেকে মাছ বড় হওয়া পর্যন্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এজন্য তিন ধরনের পুকুর প্রয়োজন। যেমন—

১. ঐতুর পুকুর

২. চারা পোনার পুকুর

৩. মজুদ পুকুর

**১. ঐতুর পুকুর :** মানব শিশু জন্মগ্রহণ করার পর যেমন ঐতুরঘরে প্রতি পালন করা হয়, মাছের ক্ষেত্রেও ঐতুর পুকুর সে কাজেই ব্যবহৃত হয়। এই পুকুরে মাছের ডিম পোনা বা রেণু পোনা লালন পালন করা হয় বলেই ঐতুর পুকুর হিসেবে পরিচিত। এ পুকুরে ৪-৫ দিন বয়সের রেণু পোনা ছেড়ে ১-২০ দিন পর্যন্ত পালন করা হয়।

ঐতুর পুকুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এই পুকুর ছোট ও অগভীর। এতে ব্যবস্থাপনা ও প্রতিপালনের সুবিধা হয়। এই পুকুরের আকার ১০-২০ শতক এবং গভীরতা এক থেকে দেড় মিটার হয়ে থাকে। পুকুরের আকার ছোট বড় হতে পারে। কিন্তু পানির গভীরতা কম হলে রৌদ্রের তাপে পানি গরম হয়ে পোনা মারা যেতে পারে। আবার পানির গভীরতা বেশি হলে ছোট পোনা পানির চাপ সহ্য করতে পারে না। ফলে মারা যেতে পারে। পোনা ধরতে বা আহরণে অসুবিধা হয়।

ঐতুর পুকুরে পোনার চাষ স্বল্পমেয়াদি। রেণু পোনা ছেড়ে ১৫-৩০ দিন পর্যন্ত পালন করে ২-৫ সেমি. আকারের ধানী পোনা পরিণত করা হয়। গ্রীষ্মকালে যে সব ডোবা, খাদ, ছোট ও অগভীর পুকুর শুকিয়ে যায় সেগুলো ঐতুর পুকুর হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

**২. চারা পোনার পুকুর :** যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে চারা পোনার পুকুর বলে। এই জাতীয় পুকুর ঐতুর পুকুর অপেক্ষা আকারে বড় হয় এবং গভীরতাও বেশি হয়। বছরে ২-৩ মাস পানি থাকে এমন পুকুর চারা পোনার পুকুর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ পুকুরের আয়তন ৩০-৫০ শতক এবং পানির গভীরতা দেড়-দুই মিটার হলে ভাল হয়। চারা পুকুরে ধানী পোনা ছাড়া হয়। এই পোনা ২-৩ মাস প্রতিপালন করে ৭-১০ সেমি পর্যন্ত চারা পোনা তৈরি করা যায়।

**৩. মজুদ পুকুর :** মজুদ পুকুরই মাছ চাষের প্রধান পুকুর। যে পুকুরে ৯-১২ সেমি. আকারের পোনা ছেড়ে লালনপালন করে তা খাওয়ার বা বাজারে বিক্রির উপযোগী করা হয় তাকে মজুদ পুকুর বলে। এ জাতীয় পুকুর আয়তনে বড় এবং কিছুটা গভীর হয়। অর্থাৎ আয়তন কমপক্ষে ৩৩ শতক এবং গভীরতা ২.৫ মিটার হতে ৩ মিটার



হলে ভালো হয়। যে কোন বন্দ্য জলাশয়ে পোনা ছেড়ে বড় মাছে পরিণত করা হলে তাকেও মজুদ পুকুর বলা যায়। মজুদ পুকুর আয়তাকার হলে ভালো হয়। এতে পানি সামান্য বাতাসে ঢেউ খেলে, ফলে পুকুরে পানি ওলট-পালট হয়। কোন বিষাক্ত গ্যাস থাকলে তা দূরীভূত হয়। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে।

### মাছ চাষের উপযোগী পুকুরের বৈশিষ্ট্য

পুকুরের মাটি ও পানির অবস্থা নিয়েই পুকুরের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পুকুরের পরিবেশের ওপরই মাছের উৎপাদন নির্ভর করে।

মাছ চাষের উপযোগী পুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

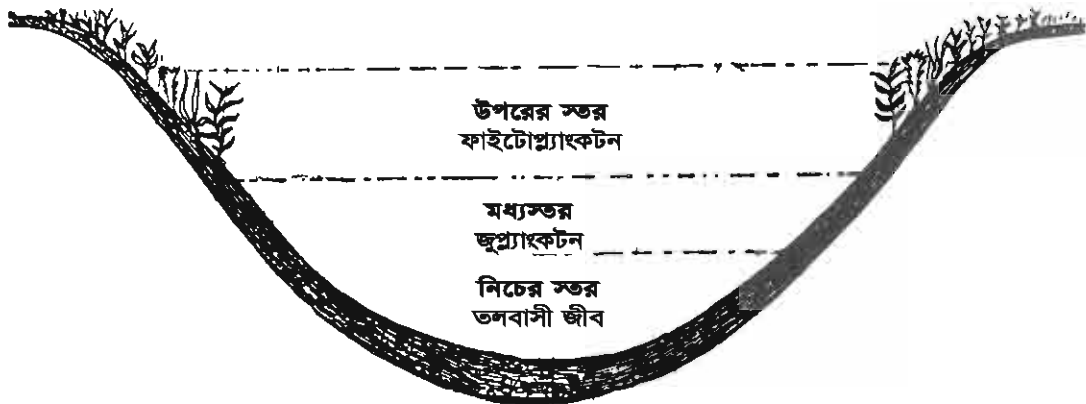
- ১। পানি ধরে রাখার ক্ষমতা হবে।
- ২। পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস ও আলোর সুবিধা থাকতে হবে।
- ৩। স্থান ও গভীরতা অনুপাতে মাছ ছাড়তে হবে।
- ৪। রাস্কুসে মাছমুক্ত অবস্থা রাখতে হবে।
- ৫। ক্ষতিকারক প্রাণীমুক্ত অবস্থা থাকতে হবে।
- ৬। প্রজনন ও বংশ বিস্তারের সুবিধা থাকতে হবে।
- ৭। প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি থাকতে হবে।
- ৮। বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহ করার সুযোগ থাকতে হবে।
- ৯। পাড়ে কোন বড় গাছ না থাকা ভাল।
- ১০। উঁচু পাড় থাকতে হবে।
- ১১। জাল টানার সুবিধা থাকতে হবে।
- ১২। সব পাড় ঠিকমত বাঁধান থাকতে হবে।
- ১৩। জলজ আগাছামুক্ত থাকতে হবে।
- ১৪। একদিকের পাড় ঢালু থাকতে হবে।

### পুকুরের বিভিন্ন স্তর

জলজগতে প্রাণীর জীবনচক্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে, একটি প্রাণী আরেকটি প্রাণীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি খেয়ে অপরটি বেঁচে থাকে। এই জাতীয় চক্রকে খাদ্যচক্র বা খাদ্য শিকল বলে। পুকুরে নানা প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে। এসব জলজ উদ্ভিদ পুকুরের পানি ও মাটি থেকে খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে সূর্যের আলো, পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে। খাদ্য তৈরির স্তরভেদে পুকুরকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়।

### উপরিভাগ

ফাইটোপ্ল্যাংকটন বা সবুজ উদ্ভিদকণা পুকুরের উপরিভাগের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে সকল মাছ তৃণভোজী তারা এই খাবার খায়। কাতলা এবং সিলভার কার্প প্রধানত পুকুরের উপরিভাগের খাবার খায়। অন্যান্য মাছের তুলনায় পুকুরে এদের বৃদ্ধি বেশি।



একটি পুকুরের বিভিন্ন স্তর ও বসবাসকারী জীব

## মধ্যভাগ

পুকুরের মধ্যভাগে রয়েছে ছোট ছোট পোকামাকড় ও প্রাণিকণা বা জুগ্‌ল্যাংকটন কণা। এরা ছোট ছোট উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে। এদের জুগ্‌ল্যাংকটনও বলা হয়। অধিকাংশ মাছেরই প্রাণিকণার প্রতি আকর্ষণ আছে। ঝুই মাছ পুকুরের মধ্যভাগের খাবার খেয়ে থাকে।

## তলদেশ

তলদেশ বলতে পুকুরের নিচের স্তরকে বোঝায়। পুকুরের তলদেশের পচা পাতা, ঘাস, তলাবাসী কীট মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়াও পুকুরের তলদেশে অনেক জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। মৃগেল ও কার্পিও মাছ তলদেশের খাবার খায়।

## ব্যবহারিক

### বিষয় : বিভিন্ন প্রকার পুকুর পরিদর্শন

#### কাজের ধাপ

- ১। শিক্ষকের সঙ্গে নিকটবর্তী কোন পুকুর দেখতে যাও।
- ২। পুকুরের বিভিন্ন স্তর শিক্ষকের কাছে বুঝে নাও।
- ৩। নিকটবর্তী কোন সরকারি/বেসরকারি খামার পরিদর্শন কর। বিভিন্ন প্রকার পুকুর দেখ।

## অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মৌসুমি পুকুরে -
  - ক. সারা বছর কমপক্ষে ১ মিটার পানি থাকে
  - খ. বছরে ৬ মাস ২ মিটার পানি থাকে
  - গ. বছরে ৩ - ৮ মাস ১ থেকে  $1\frac{1}{2}$  মিটার পানি থাকে
  - ঘ. বছরে ৯ মাস ১ মিটার পানি থাকে
২. আয়তাকার মজুদ পুকুরে সামান্য বাতাসে ঢেউ খেলে পানি ওলট পালট হওয়ায় পানিতে-
  - i. ফাইটোপ্ল্যাংকটন নষ্ট হয়ে যায়
  - ii. অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়
  - iii. বিশুদ্ধ গ্যাস দূরীভূত হয়

#### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |            |
|-------------|------------|
| ক. i        | খ. i ও ii  |
| গ. ii ও iii | ঘ. i ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ - ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মতিয়ার রহমান ধানী পোনা সংগ্রহ করে ৪৫ শতকের একটি পুকুরে ছাড়েন। বছরে ২ - ৩ মাস পানি থাকে বলে তিনি এই সময়ের মধ্যেই পোনা চাষ করে সরাসরি মজুদ পুকুরের মালিকদের নিকট বিক্রয় করেন।

৩. রেণু পোনা কতদিনে ধানী পোনা পরিণত হয় ?

ক. ১ - ১৫

খ. ১৫ - ৩০

গ. ৩০ - ৪৫

ঘ. ৪৫ - ৬০

৪. মতিয়ার রহমানের পুকুরটি কোন ধরনের পুকুর ?

ক. আঁতুড় পুকুর

খ. চারা পোনার পুকুর

গ. ধানী পোনার পুকুর

ঘ. মজুদ পুকুর

৫. মতিয়ার রহমানের পুকুরের মত এ জাতীয় পুকুরে ২ - ৩ মাসে পোনার আকৃতি হয় -

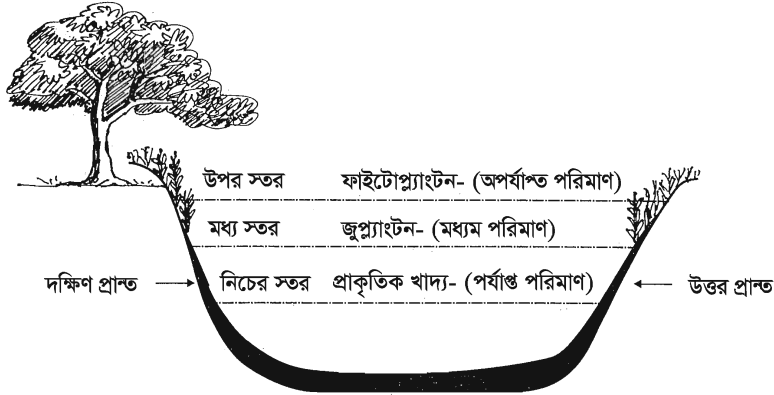
ক. ২ - ৫ সে.মি

খ. ৭ - ১০ সে.মি

গ. ৯ - ১২ সে.মি.

ঘ. ১২ - ১৫ সে.মি

সৃজনশীল প্রশ্ন



চিত্র - পুকুর

ক. জুপ্ল্যাংকটন কী ?

খ. চিত্রের পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটন কম থাকার ১টি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. পুকুরটির স্তরভেদে মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন কর।

ঘ. পুকুরে মাছের উৎপাদন ভালো পাওয়ার ক্ষেত্রে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### মাছ চাষে করণীয় কাজ

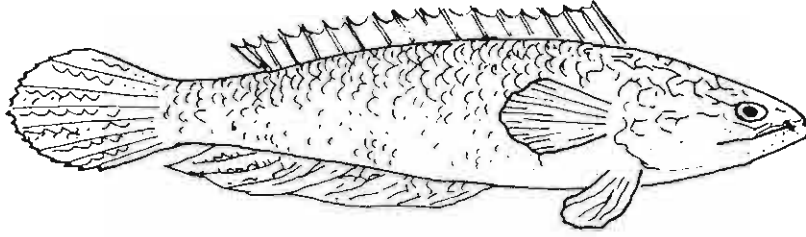
ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষিজমিকে যেমন প্রস্তুত করতে হয়, মাছ চাষ করতে হলে পুকুরকেও তেমনি প্রস্তুত করতে হয়। পুকুর প্রস্তুতির কাজগুলো পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল :

#### (১) পুকুর সংস্কার

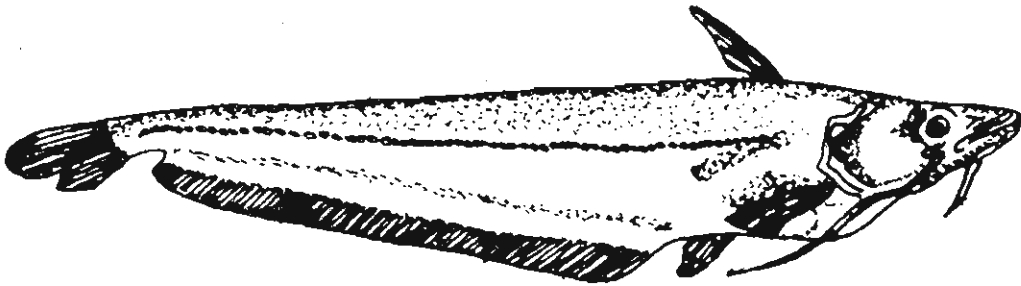
পুকুর সংস্কার বলতে পুকুর পরিষ্কার, পাড় মেরামত ও তলদেশ ঠিক করাকে বোঝায়।

##### তলদেশ সংস্কার

পুকুরের তলদেশ যদি অসমান থাকে তবে তা সমান করে নিতে হবে। নতুবা জ্বাল টানতে অসুবিধা হবে। অনেক সময় পুকুরের তলায় অনেক কাদামাটি থাকে, এতে পানি ঘোলা দেখায়। পানি বেশি ঘোলা হলে সূর্যের আলো পুকুরের তলায় পৌঁছাতে পারে না। তখন পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য প্রস্তুত হতে পারে না। কাদামাটির জন্য পুকুরের তলায় বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হয়। ফলে পানি দূষিত হয়ে যায়, অক্সিজেনের অভাব হয়। কাদামাটির পরিমাণ ৪০ সেমি. এর বেশি হলে তবে তা তুলে ফেলতে হবে।



শোল মাছ



বোয়াল মাছ

##### পাড় মেরামত

পুকুরের পাড় উঁচু এবং বন্যামুক্ত হতে হবে। পাড় যদি ভাঙা বা অসমান থাকে তা মেরামত করতে হবে। পুকুর পাড়ে যেন বড় গাছপালা না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বড় গাছপালার ডালপালা পানিতে সূর্যের আলো পড়তে বাধা দেয়।

## (২) আগাছা ও শেওলা দমন

পানিতে স্বাভাবিক নিয়মে আগাছা ও শেওলা জন্মাবেই। এগুলো পোনার জন্য খুব ক্ষতিকর। আগাছা ও শেওলা তুলে পুকুর পরিষ্কার করতে হবে। আগাছা পুকুরে সূর্যের আলো পৌঁছাতে বাধা দেয়। পুকুরে রোগজীবাণু ছড়ায়, পোনার চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করে।

## (৩) রাস্কুসে মাছ নিধন

যে সব পুকুর শুকিয়ে যায় সেগুলোতে রাস্কুসে মাছ আপনা-আপনিই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু যে সব পুকুর শুকায় না সেগুলো হতে নিচের যে কোন একটি পদ্ধতির দ্বারা রাস্কুসে মাছ নিধন করা যায়।

জমির আগাছা ফসলের ক্ষতি করে তেমনি রাস্কুসে মাছ পুকুরে চাষযোগ্য মাছের পোনা খেয়ে ফেলে। শোল, বোয়াল, গজার, টাকি প্রভৃতি রাস্কুসে স্বভাবের মাছ।

## রোটেনন পদ্ধতি

রোটেনন পাউডার, মাছ মারার বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শতক প্রতি ৩০ সেমি গড় গভীরতার পানিতে ৩৫ গ্রাম পাউডার দিতে হবে। পুকুরের গড় গভীরতা এবং আয়তন অনুযায়ী রোটেনন পাউডার বালতির মধ্যে পানিতে খুব ভাল করে গুলাতে হবে। এই সময় পরিষ্কার কাপড় দিয়ে নাক ও মুখ ঢেকে রাখতে হবে। তারপর সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানোর পর জাল টেনে সমস্ত পুকুর ওলট-পালট করে দিতে হবে। মাছ ভাসতে শুরু করলে আবার জাল টেনে মাছ তুলে ফেলতে হবে।

রোটেননের বিষক্রিয়া ৭ দিন পর্যন্ত থাকে। অর্থাৎ ৭ দিন পর্যন্ত ঐ পুকুরের পানি ব্যবহার করা যাবে না। রোটেনন ব্যবহারে মাছ খাওয়া যায়।

## পানি সেচ পদ্ধতি

যে সব পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায় না, রাস্কুসে মাছ নিধন করার জন্য সেসব পুকুরের পানি সেচের মাধ্যমে শুকাতে হবে। শ্যালো মেশিন দ্বারা পানি সেচে ফেলে দিয়ে মাছ ধরতে হবে। তারপর কড়া রোদে পুকুর শুকাতে হয়। পুকুর সেচের কাজটি বর্ষার পূর্বে অর্থাৎ ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাসে করা সবচেয়ে ভাল। কারণ এতে সূর্যের তাপে পুকুরের তলার মাটি শুকিয়ে যায় এবং ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যায়।

## বিষ প্রয়োগ পদ্ধতি

যেসব পুকুরে পানি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায় না, সেসব পুকুরে রাস্কুসে মাছ নিধন করার জন্য বিষ প্রয়োগ করতে হয়। বিষ অনেক প্রকারের আছে। কিছু ট্যাবলেট আছে যেগুলো মাছ মারার জন্য পুকুরে ব্যবহার করা হয়। ফসটকসিন তেমনি একটি ট্যাবলেট। প্রতিটি ট্যাবলেটের ওজন ৩ গ্রাম। শতক প্রতি ৩০ সেমি. পানির গড় গভীরতায় ১টি ট্যাবলেট হিসেবে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়। তারপর জাল টেনে পানি ওলট-পালট করে দিতে হয়। ট্যাবলেট ছিটানোর ১-২ ঘণ্টা পর মাছ মরে ভাসতে শুরু করবে। যে পুকুরে এই বিষ দেওয়া হবে সেই পুকুরের পানি ৭-১০ দিন ব্যবহার করা যাবে না। ফসটকসিন খুব বিষাক্ত। তাই এটি কৌটা থেকে বের করার আগে কোনো কাপড় দিয়ে নাক ভাল করে বেঁধে নিতে হবে। এ পদ্ধতি প্রয়োগ না করা ভাল।

## (৪) চুন প্রয়োগ

মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুত করার সময় চুন প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

### চুন প্রয়োগের উপকার

ক. ক্ষতিকর রোগজীবাণু ধ্বংস হয়।

খ. মাটি ও পানির গুণাগুণ ঠিক থাকে।

গ. মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

পুকুরে প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হয়। যদি পুকুর শুকনা হয় তবে তলায় চুন ছিটিয়ে দিতে হয়। পুকুরে পানি থাকলে চুন আগে গুলে ঠান্ডা করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

### (৫) সার প্রয়োগ

পোনার স্বাভাবিক খাবার তৈরির জন্য সার প্রয়োগ করতে হয়। সার দুই প্রকার। যথা—

ক. জৈব সার ও খ. অজৈব সার বা রাসায়নিক সার

চুন দেওয়ার ৫-৭ দিন পর জৈব সার হিসেবে প্রতি শতকে ৫-৭ কেজি গোবর সার দিতে হয়। আর অজৈব সার প্রতি শতকে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি দিতে হয়। পুকুরের পানির রং যদি সবুজ বা বাদামি রঙের হয় তাহলে বুঝতে হবে পুকুরের পানিতে প্রচুর প্রাকৃতিক খাবার আছে।

### (৬) ক্ষতিকর পোকা দমন

পোনার পুকুরে সার দেওয়ার পর সাধারণত হাঁসপোকাসহ বড় ধরনের কীটপতঙ্গ জন্মে। তারা মাছের পোনা খেয়ে ফেলে বা খাদ্যের জন্য পোনার সাথে প্রতিযোগিতা করে। তাই পুকুরে পোনা মজুদের পূর্বে এসব ক্ষতিকর পোকা মেরে ফেলতে হবে।

প্রতিষেধক হিসেবে ডিপটারেক্স, সুমিথিয়ন, কেরোসিন ব্যবহার করা যায়।

এসব কীটনাশক ব্যবহার করলে পোনার খাবার ছোট প্রাণিকণা বেঁচে থাকবে। কিন্তু ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ মারা যাবে।

### (৭) হররা টানা

ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ মেরে ফেলার পর পুকুরে কয়েকবার হররা টানা উচিত। এতে পুকুরের তলার বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে যায়। হররা আমাদের দেশীয় জিনিস। একটা মোটা বাঁশের দুই প্রান্তে দড়ি বেঁধে বাঁশটি পুকুরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টানা হয়। বাঁশটি পুকুরের তলদেশের মাটি আলোড়িত করে দেয়। এতে ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাস বের হয়।

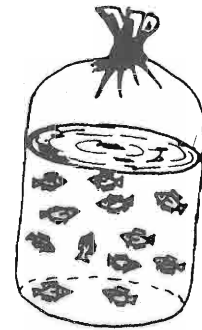
এখন পুকুর পোনা মজুত করার উপযুক্ত হয়েছে। তাই এখন আমাদের পুকুরে পোনা ছাড়তে বা মজুদ করতে হবে।

বড় মাছ চাষের পুকুরে অর্থাৎ মজুদ পুকুরে পোনা মজুদ করা হয়। এই পোনা আমাদেরকে চারা পোনা পুকুর হতে আহরণ বা ধরতে হবে। পোনা আহরণ করার সবচেয়ে ভাল সময় হল সকালবেলা। সকালবেলা পোনা আহরণ করলে পোনা মারা যাওয়ার ভয় থাকে না।

### (৮) পোনা মজুদকরণ

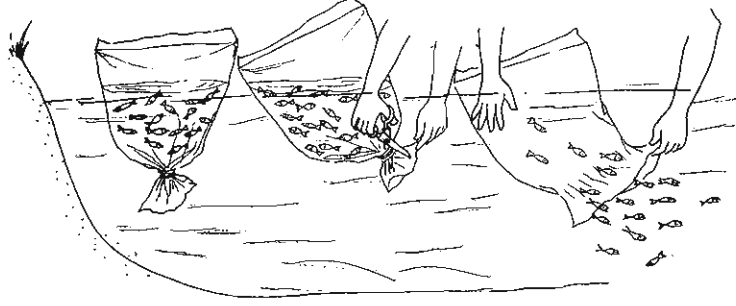
সার প্রয়োগের ৭ দিন পর পোনা মজুদ করতে হয়। পুকুরে পোনা ছাড়াকেই পোনা মজুদকরণ বলা হয়। পোনা সরাসরি পুকুরে ছাড়া ঠিক নয়। কারণ যে পাত্রে পোনা ছিল সেটার পানির তাপমাত্রা এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রা এক রকম হয় না।

এ অবস্থায় পোনা পুকুরে না ছেড়ে পোনার পাত্র বা পলিব্যাগ আংশিকভাবে কিছুক্ষণ পুকুরে ডুবিয়ে রাখতে হবে। আস্তে আস্তে পুকুরের পানি পাত্রের পানির সাথে মেশাতে হবে। এভাবে এক সময় পাত্রের পানির তাপমাত্রা এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমান হবে। তখন পাত্রটিকে কাত করে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। যেন পোনাগুলো ইচ্ছামত বের হয়ে পুকুরের



পলিব্যাগে পোনা পরিবহণ

পানিতে চলে যেতে পারে। সকাল ও সন্ধ্যায় পুকুরের পানি ঠান্ডা থাকে। তখনই পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়।



পুকুরে পোনা ছাড়া

### পোনা মজুদের পরবর্তী পরিচর্যা

পুকুরে মাছের পোনা মজুদ করার পরদিন থেকে প্রতি সপ্তাহে নিম্নোক্ত হারে সার দিতে হবে।

১ম সপ্তাহে : প্রতি শতকে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি।

২য় সপ্তাহে : প্রতি শতকে ৪-৫ কেজি গোবর বা ৩-৪ কেজি মুরগির বিষ্ঠা।

৩য় সপ্তাহে : প্রতি শতকে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি।

৪র্থ সপ্তাহে : প্রতি শতকে ৪-৫ কেজি গোবর সার।

### প্রয়োগ পদ্ধতি

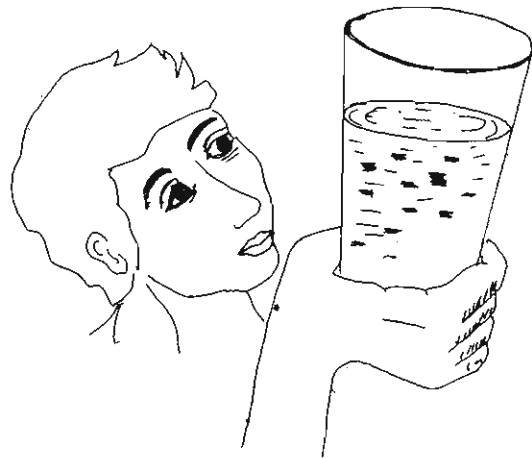
অজৈব সারের মধ্যে শুধুমাত্র টিএসপি সারা রাত্রি পানিতে ভিজিয়ে সকালে ইউরিয়া ও জৈব সার একত্রে মিশিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

### পানিতে মাছের খাদ্য পরীক্ষা

পুকুরে চাহিদার তুলনায় মাছের খাদ্য ও সার বেশি বা কম হলে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়, মাছের ক্ষতি হয়। সেজন্য পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার আছে কি না তা পরীক্ষা করা দরকার।

১ম পরীক্ষা : পানিতে কনুই পর্যন্ত হাত ডুবানোর পর যদি হাতের তালু দেখা না যায় বুঝতে হবে পানিতে পর্যাপ্ত খাবার আছে। হাতের তালু দেখা গেলে খাবারের অভাব বুঝতে হবে। এ অবস্থায় পুকুরে সার দিতে হবে।

২য় পরীক্ষা : অল্প পরিমাণ পানি কাচের গ্লাসে নিয়ে পরিক্ষার আলোতে দেখলে যদি এতে খুব ছোট ছোট পোকা বা সবুজ রং দেখা যায়। তাহলে বুঝতে হবে পানিতে খাবার আছে। যদি পরিক্ষার পানি দেখা যায় তাহলে খাবার নেই। সার প্রয়োগ করতে হবে।



পুকুরের পানিতে খাদ্য পরীক্ষা

## খাদ্য যোগান

পুকুরে যে সার প্রয়োগ করা হয় অনেক সময় তাতে পর্যাপ্ত খাবার জন্মায় না। সে জন্য পুকুরে বাইরে থেকে খাবার দিতে হয়। মাছের খাদ্য হিসেবে পুকুরে বাইরে থেকে যে খাবার সরবরাহ করা হয় তাকে সম্পূরক খাদ্য বলে।

আমাদের খাদ্যে ছয় ধরনের উপাদান আছে। যেমন— আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, লবণ ও পানি। এ উপাদানগুলো দেহের বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। মাছের খাদ্যেও এ সব উপাদান আছে। আমাদের দেশে চাউলের কুঁড়া, গমের ভুশি, সরিষার খৈল, তিলের খৈল সাধারণত মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাপ্যতার উপর সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে। অর্থাৎ পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য কম বা বেশির জন্য সম্পূরক খাদ্য কম বা বেশি ব্যবহার করতে হয়। পুকুরে মোট মাছের ওজনের ২-৩ ভাগ হারে দৈনিক খাবার প্রয়োগ করতে হয়।

## স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পরীক্ষা ও পোনা পর্যবেক্ষণ

প্রতি মাসে পুকুরে জাল টেনে দেখতে হবে যে—

১। মাছের সাধারণ বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে কি না।

২। শরীরে রোগের কোন চিহ্ন আছে কি না। যেমন—

গায়ে অতিরিক্ত আঠালো পিচ্ছিল পর্দাখ বা ক্ষত চিহ্ন।

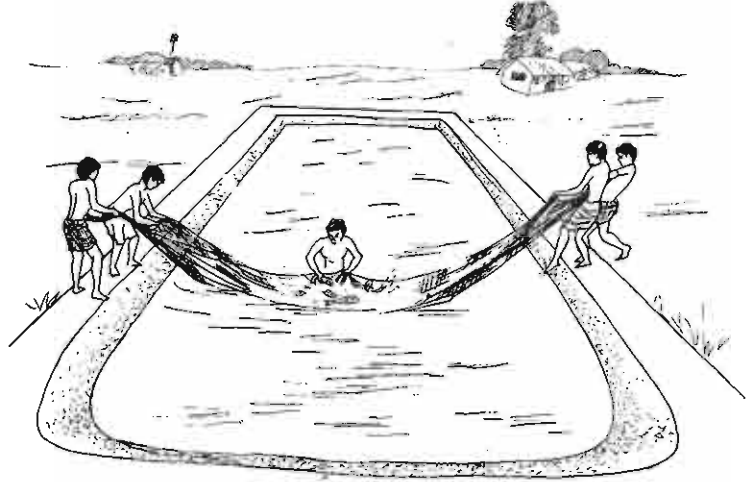
৩। স্বাভাবিক রং ফ্যাকাশে হওয়া।

৪। চামড়া ও পাখনা ক্ষয়ে যাওয়া।

৫। ফুলকা ক্ষয়ে যাওয়া।

৬। পেট ফোলা।

৭। আঁশ উঠা বা পড়ে যাওয়া।



জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

## পোনা মাছের প্রাপ্তি স্থান

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি খামারে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত পোনা পাওয়া যায়। তাছাড়াও প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন পোনা হালদা, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদীতে পাওয়া যায়। এসব নদীতে গ্রীষ্মের শেষে এবং বর্ষাকালে বেশকিছু পরিমাণ চাষোপযোগী কার্পাজাতীয় মাছের পোনা পাওয়া যায়। কেবলমাত্র হালদা নদীতেই ডিম পোনা পাওয়া যায়। অন্য নদীগুলোতে রেণু ও ধানী পোনা পাওয়া যায়।

## মাছ আহরণ

পুকুর থেকে মাছ জাল দিয়ে ধরাকে আহরণ করা বলা হয়। মাছের দেহের বৃদ্ধি এবং পুকুরের উৎপাদনের ওপর লক্ষ্য রেখে মাছ আহরণ করতে হয়। মাছের দেহের বৃদ্ধি নির্ভর করে। যেমন—

১। মাছের ঘনত্ব বা পুকুরে মাছের পরিমাণ, ২। মাটির উর্বরতা, ৩। পানির গুণাগুণ, ৪। খাবার প্রয়োগ এবং ৫। পুকুর ব্যবস্থাপনা।

প্রত্যেক পুকুরের নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। এর বেশি হলে মাছের দেহের বৃদ্ধি কমতে থাকে। তখন মাছ শুধু বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক খাবার খায়। মাছের গড় বৃদ্ধি একেবারেই থেমে যায়। শ্রাবণ-ভাদ্র



মাসে পোনা ছাড়া হলে সেগুলো অগ্রহায়ণ পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। শীতে মাছের দেহের বৃদ্ধি কমে যায়। গরমের সময় মাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।



মাছ আহরণ

মাছ আহরণের সময় নিম্নের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

- ১। বাজারে মাছের চাহিদা।
- ২। সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প, ৫ থেকে ৬ মাসের মধ্যেই ১ কেজি ওজনের হয়। কাজেই সেগুলোর প্রথমে বাজারজাত করতে হবে।
- ৩। বড় মাছ যে অনুপাতে ধরা হবে, সে অনুপাতে পোনা ছাড়তে হবে।
- ৪। মাছ আহরণের সঙ্গে সঙ্গে পোনা ছাড়লে লাভ অনেক বেশি পাওয়া যায়।
- ৫। বছরে একবার সমস্ত মাছ আহরণ করতে হবে।
- ৬। বাজার দর ও চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে সময় ঠিক করতে হবে।

মাছ আহরণের পর পুকুর ফেলে রাখা যাবে না। যদি সংস্কার করার প্রয়োজন হয় তবে তা করতে হবে। আর যদি পুকুর পোনা ছাড়ার উপযোগী থাকে তবে মাছ ধরার পর নির্দিষ্ট নিয়মে পোনা ছাড়তে হবে।

## ব্যবহারিক

বিষয় : রাস্কুসে মাছ নিধনের বিষ, চুন ও সার পরিচিতি

### উপকরণ

- (১) রোটেনন      (২) ফসটকসিন      (৩) চুন      (৪) ইউরিয়া, টিএসপি

### কাজের ধাপ

- (১) ব্যবহারিক ক্লাসে রোটেনন, ফসটকসিন দেখ।
- (২) চুন, ইউরিয়া, টিএসপি কোথায় পাওয়া যায় শিক্ষকের কাছ থেকে তা জেনে নাও।
- (৩) চুন, ইউরিয়া পুকুরে প্রয়োগ করতে শিখে নাও।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. রোটেননের বিক্রিয়া পুকুরে কত দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে ?  
ক. ২ দিন খ. ৪ দিন  
গ. ৫ দিন ঘ. ৭ দিন
২. প্রতি মাসে পুকুরে জাল টেনে দেখার কারণ-  
i. মাছ আহরণের উপযোগিতা পরীক্ষা করা ii. মাছের সাধারণ বৃদ্ধি পরীক্ষা করা  
iii. পুকুরে খাবারের পর্যাপ্ততা পরীক্ষা করা

### নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i খ. ii  
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩-৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কামাল একজন মৎস্যজীবী। তার এলাকার ২টি পুকুরে তিনি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত মাছের পোনা ছাড়েন এবং লক্ষ করেন পোনা মরে ভেসে উঠেছে। এক সপ্তাহ পরে তিনি পুকুরে সার প্রয়োগ করতে গেলেন। তবে সার প্রয়োগের পূর্বেই পুকুরের পানিতে খাদ্য পরীক্ষা করা দরকার বলে জনৈক প্রতিবেশী তাকে জানান।

৩. পুকুরে পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়-  
ক. সকাল ও দুপুর খ. দুপুর ও সন্ধ্যা  
গ. দুপুর ও বিকাল ঘ. সকাল ও সন্ধ্যা
৪. পুকুরে চাহিদার তুলনায় যদি মাছের খাদ্য ও সার বেশি হয় তবে -  
i. পানির গুণাগুণ নষ্ট হয় ii. মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে  
iii. মাছের ক্ষতি হয়

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. ii ও iii  
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. কামাল সাহেব কীভাবে বুঝবেন পুকুরের মাছের পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে ?  
i. পানিতে কনুই পর্যন্ত হাত ডুবানোর পর হাতের তালু দেখা না গেলে  
ii. পানিতে খুব ছোট ছোট পোকা বা সবুজ রং দেখা গেলে  
iii. পানি পরিষ্কার দেখা গেলে

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. ii ও iii  
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. ৩য় সপ্তাহে কামাল সাহেব প্রতি শতকে কী পরিমাণ সার প্রয়োগ করবেন ?  
ক. ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টি.এস.পি খ. ৪ কেজি ইউরিয়া ও ৫ কেজি টি.এস.পি  
গ. ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টি.এস.পি ঘ. ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টি.এস.পি

### সৃজনশীল প্রশ্ন

মোঃ নূরুল ইসলাম তার ১০ শতাংশের একটি পুকুরে সংস্কার ছাড়াই আষাঢ় মাসে বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা ছাড়েন। মাঝে মাঝে খাবার দেন। কিন্তু ফাল্গুন মাসে মাছ আহরণের সময় দেখেন অনেক জাতের মাছের কোন অস্তিত্বই নেই। তাছাড়া মাছের পরিমাণও আশানুরূপ নয়। হতাশ হয়ে তিনি স্থানীয় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি জানান যে, পুকুর সংস্কার না করে মাছের পোনা ছাড়ায় এ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে।

- ক. পুকুর সংস্কার কী ?  
খ. একই পুকুরে নূরুল ইসলাম বিভিন্ন জাতের পোনা ছাড়েন কেন ?  
গ. নূরুল ইসলাম কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পুকুরটি সংস্কার করবেন তা বর্ণনা কর।  
ঘ. পুকুর সংস্কার না করে মাছের পোনা ছাড়ার ক্ষতিকর দিকগুলো ব্যাখ্যা কর।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ নাইলোটিকা মাছ

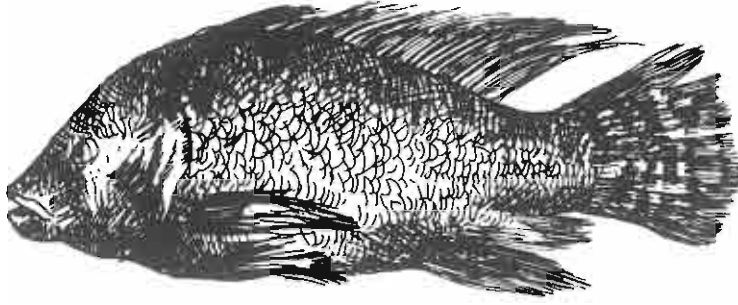
### পরিচিতি

নাইলোটিকা ১৯৭৪ সালে থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আনা হয়। আমাদের পরিবেশ ও জলবায়ু এই মাছের জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমানে আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে নাইলোটিকার চাষ করা হচ্ছে।

নাইলোটিকা মাছের আঁইশ আছে। মাছটি ছোট অবস্থায় দেখতে অনেকটা কই মাছের মত। লেজের পাখনা ও পিঠে কালো ডোরাকাটা দাগ আছে। পেটের দিক হালকা ধূসর রঙের হয়।

### নাইলোটিকা মাছের জীবনচক্র

নাইলোটিকার ডিম ফোটানোর পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরনের। এ ধরনের মাছের ডিম মাছের মুখের ভিতরই ফুটে পোনা হিসেবে বের হয়ে আসে। ডিম এবং পোনার প্রতি যত্ন নেওয়া স্ত্রী মাছের কাজ। নিষিক্ত ডিমগুলো স্ত্রীমাছ



নাইলোটিকা মাছ

মুখে রেখে দেয়। ডিম সেখানেই ফুটে বাচ্চা হয়। বাচ্চা মুখে নিয়ে স্ত্রীমাছ ঘুরে বেড়ায় কিন্তু ঐ অবস্থায় কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। মা মাছের মুখের ভিতর ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে ৮-১০ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। এ বাচ্চাগুলো ৭-৮ মিমি. আকার পর্যন্ত বড় হলে মা মাছ এদেরকে পানিতে ছেড়ে দেয়। পানিতে ছেড়ে দেওয়ার পরও মা মাছ এদের যত্ন নেয়। পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কোনো বিপদ দেখলে মা মাছ এদেরকে মুখে নিয়ে নেয়। ১০ দিনের মধ্যেই মা মাছ পোনাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে দেয়।



নাইলোটিকা মাছের পোনা পালন

## নাইলোটিকা মাছের গুণাগুণ

- ১। এ মাছ অল্প সময়ে চাষ করা যায়। ২-৩ মাসের মধ্যেই বাজারে বিক্রি করার উপযোগী হয়।
- ২। অল্প পানিতে চাষযোগ্য। ছোট ও অগভীর পুকুর, ডোবা, খাল, মৌসুমি পুকুর, ধানক্ষেতজাতীয় জলাশয়গুলো এই মাছ চাষে ব্যবহার করা যায়।
- ৩। এই মাছের পোনা সহজে পাওয়া যায়।
- ৪। এরা সব ধরনের খাবার খায়।
- ৫। সহজে রোগাক্রান্ত হয় না।
- ৬। তিন মাসে ২০০-৩০০ গ্রাম ওজন হতে পারে।
- ৭। এ মাছ খেতে খুব সুস্বাদু।
- ৮। এরা বছরে ৩-৪ বার বাচ্চা দেয়।
- ৯। একই পুকুরে বছরে দুই বার চাষ করা যায়।
- ১০। অল্প খরচে চাষ করা যায়।

## পুকুর নির্বাচন

নাইলোটিকা মাছ চাষের জন্য ৫ শতক বা তার কম আয়তনের পুকুর দরকার, যেখানে বছরে ৬ মাস পানি থাকে। পুকুরের গভীরতা দেড় মিটারের মধ্যে রাখা ভাল।

## পুকুর প্রস্তুতি

পাড় ভাঙা থাকলে তা ঠিক করতে হবে। পাড় যেন খাড়া না হয়। ভিতরের দিকে ক্রমশ ঢালু হবে। তলদেশ অসমান থাকলে তা সমান করতে হবে। পুকুরের তলায় ৩০ সেমি. এর বেশি কাদা থাকলে তা সরাতে হবে। পাড়ে বড় গাছ থাকলে তা কেটে ফেলতে হবে। পুকুরের জলজ আগাছা (কলমি, হেলেক্সা) পরিষ্কার করতে হবে।

## রাস্কুসে মাছ নিধন

পুকুর শুকিয়ে অথবা রোটেনন বা ফসটকসিন প্রয়োগ করে রাস্কুসে মাছ (বোয়াল, শোল, টাকি, গজার) সরিয়ে ফেলতে হবে।

## চুন প্রয়োগ

রাস্কুসে মাছ অপসারণের পর প্রতি শতকে এক কেজি চুন দিতে হবে। চুন আগের রাতে বালতিতে গুলে ঠান্ডা করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

## সার প্রয়োগ

চুন দেওয়ার ৭ দিন পর জৈব (গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা) ও রাসায়নিক (ইউরিয়া, টিএসপি) সার দিতে হবে। প্রতি শতকে ৮-১০ কেজি গোবর দিতে হবে। গোবর দেওয়ার পর প্রতি শতকে ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২০০ গ্রাম ইউরিয়া দিতে হবে। রাসায়নিক সার একত্রে মিশিয়ে পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের ৫-৭ দিনের মধ্যে পানির রং সবুজ হলে পোনা ছাড়া যাবে।

## পোনা সংগ্রহ

পুকুরে সব সময় বড় পোনা অর্থাৎ ৫-৭ সেমি আকারের পোনা ছাড়া ভাল। এতে পোনা মরে না। সরকারি বা বেসরকারি খামারে এই মাছের পোনা পাওয়া যায়। প্রতি শতকে ৫-৭ সেমি আকারের ৩০-৩৫ টি পোনা ছাড়া যায়।

## পোনা মজুদ

পোনা যদি পলিখিন ব্যাগে আনা হয় তবে পলিখিন ব্যাগটি পুকুরে আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। কারণ সব পানির তাপমাত্রা এক থাকে না। সরাসরি পোনা পুকুরে ছাড়লে নতুন তাপমাত্রায় পোনাগুলো টিকে থাকতে পারে

না। পলিথিন ব্যাগের মুখ খুলে অল্প করে পুকুরের পানি ব্যাগের ভিতর দিতে হবে। এভাবে ব্যাগের পানি পুকুরে যাবে এবং পুকুরের পানি ব্যাগে যাবে। এতে ব্যাগের ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান হবে। ব্যাগের মুখ পানিতে ডুবিয়ে রাখলে পোনাগুলো সহজেই পুকুরে চলে যাবে।

### খাদ্য প্রয়োগ

আমরা জানি নাইলোটিকা সর্বভুক প্রাণী। এই মাছের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি দিন চাউলের কুঁড়া ৬০ ভাগ, সরিষার খৈল ২৫ ভাগ ও ক্ষুদি পানা ১৫ ভাগ এই হারে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে নাইলোটিকা সব ধরনের খাবার খায়। খাবার ২ ভাগ করে সকাল ও বিকালে দিতে হবে। খাবার ছিটিয়ে দেওয়া যায়। আবার পুকুরের নির্দিষ্ট জায়গায় খাবার দেওয়া যায়। এতে অপচয় কম হয়।

### সার প্রয়োগ

পুকুরের পানি পরিষ্কার হলে প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব বুঝতে হবে। পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য প্রতি শতকে ১৫০ গ্রাম গোবর দিতে হবে। ১০ দিন পর পর প্রতি শতকে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। পানির রং সবুজ বা বাদামি হলে সার প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

### মাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা

প্রতিমাসে কমপক্ষে ১ বার জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা করা উচিত। যদি মাছের বৃদ্ধি ভাল না হয় তাহলে প্রাকৃতিক খাদ্য এবং সম্পূরক খাদ্যের দিকে খেয়াল দিতে হবে।

### মাছ ধরা

দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে মাছের ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম হলে বড় মাছগুলো ধরতে হবে। তাহলে পোনা মাছ বড় হওয়ার সুযোগ পাবে।

## ব্যবহারিক

### বিষয় : নাইলোটিকা মাছের পরিচিতি

#### উপকরণ

- (১) একটি নাইলোটিকা মাছ/নাইলোটিকা মাছের পোনা।
- (২) একটি ট্রে।

#### কাজের ধাপ

- (১) মাছের সঙ্গে পরিচ্ছেদে বর্ণিত অংশগুলো মিলিয়ে নাও।
- (২) শিক্ষকের নিকট ভালমত বুঝে নাও।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

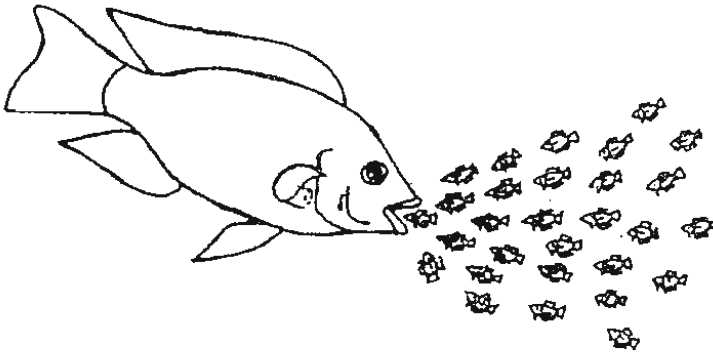
১. নিচের কোন গ্রুপটি রাঙ্কুসে মাছ?

ক. গজার, শোল ও টাকি

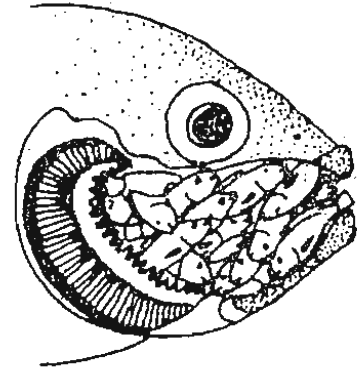
খ. বোয়াল, বুই ও টাকি

গ. গজার, সিলভার কার্প ও শোল

ঘ. শোল, মৃগেল ও বোয়াল



চিত্র: ১



চিত্র: ২

চিত্র: ৩

চিত্র দেখে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২. মা মাছের চিত্র হলো-

ক. চিত্র : ১ ও ২

খ. চিত্র : ১ ও ৩

গ. চিত্র : ২ ও ৩

ঘ. চিত্র : ২

৩. চিত্র-২ এ মাছের বয়স কত দিন?

ক. ৯-১০

খ. ১২-১৩

গ. ১৪-১৫

ঘ. ১৬-১৭

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১০ম শ্রেণীর ছাত্র রহিমের আগ্রহে তার বাবা তার বাড়ির পাশবর্তী ৩ শতকের একটি ছোট্ট পুকুরে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত নেয়। ছোট্ট পুকুরে কী ধরনের মাছ চাষ করা যায় এ নিয়ে রহিমের বাবা বেশ চিন্তিত। কিন্তু বুদ্ধিমান রহিম তার বাবাকে পুকুর প্রস্তুত করে নাইলোটিকা মাছ চাষ করতে পরামর্শ দেয়। কৃষিশিক্ষা জ্ঞানের আলোকে তারা কম খাদ্য দিয়ে ও পরিমিত সার প্রয়োগ করে মাছের উৎপাদন লাভজনক করে তোলে।

ক. নাইলোটিকার উৎপত্তি কোন দেশে ?

খ. নাইলোটিকার একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর ?

গ. রহিম পুকুরে কী পরিমাণ সার প্রয়োগ করবে তার একটি সারণি তৈরি কর।

ঘ. রহিমের বাবার পুকুরে নাইলোটিকা মাছ লাভজনক হল কেন তা ব্যাখ্যা কর।

## পঞ্চম অধ্যায় গৃহপালিত পাখি পালন

### প্রথম পরিচ্ছেদ গৃহপালিত পাখির পরিচিতি

পৃথিবীতে বহু ধরনের পাখি আছে। এদের সবই কিছু গৃহপালিত নয়। যে সকল পাখি আমরা গৃহে পালন করি এবং যা আমাদের অনেক উপকারে আসে, সেগুলোকে গৃহপালিত পাখি বলে। হাঁস-মুরগি ও কবুতর আমাদের অতি পরিচিত গৃহপালিত পাখি। বাংলাদেশের গ্রামে প্রায় বাড়িতেই এগুলো পালন করা হয়। সাধারণত মেয়েরাই এদের পালন করে থাকে। গৃহপালিত পাখি থেকে আমরা মাংস ও ডিম পেয়ে থাকি। এগুলো বিক্রি করে আমরা নগদ অর্থও পাই।

এসব পাখির পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

#### মুরগি

সাধারণত দুই ধরনের মুরগি আমাদের দেশে পাওয়া যায়, যেমন—

১। দেশি মুরগি ও ২। উন্নত জাতের মুরগি

#### দেশি মুরগি

১। দেশি মুরগির গায়ের রং মিশ্র বর্ণের হয়ে থাকে ২। এদের ওজন খুব কম



দেশি মুরগি

৩। এরা আকারে ছোট

৪। দেশি জাতের মুরগি বছরে মাত্র ৪০-৬০টি ডিম দিয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের আছিল মুরগি দেশি জাতের একটি উদাহরণ।

#### উন্নত জাতের মুরগি

উন্নত জাতের মুরগি বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আমদানি করা হয়েছে। এ ধরনের মুরগি হতে অধিক পরিমাণে মাংস ও ডিম পাওয়া যায়।

## হোয়াইট লেগহর্ন

ইতালি দেশের লেগহর্ন নামক স্থানে এ জাতের মুরগি প্রথম পাওয়া যায়। এদের পালকের রং সাদা। ডিমের জন্য এরা বিখ্যাত। আমাদের দেশে বছরে এরা ২০০-২৫০টি পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। এদের ডিমের আকার বেশ বড় এবং রং সাদা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বর্তমানে এ জাতের মুরগি পাওয়া যায়।



হোয়াইট লেগহর্ন

## অস্ট্রালপ

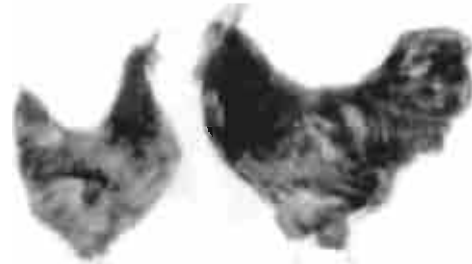
এ জাতটির উৎপত্তি অস্ট্রেলিয়ায়। মাংস ও ডিমের জন্য এজাতের মুরগি পালন করা হয়। এদের পালকের রং কালো। বছরে আমাদের দেশে এরা ১৫০-২০০টি পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। ডিমের রং বাদামি। এ জাতের মুরগির ওজন ২-৩ কেজিরও বেশি হয়ে থাকে। অস্ট্রালপ মুরগি বর্তমানে অনেক দেশেই পাওয়া যায়।



অস্ট্রালপ

## রোড আইল্যান্ড রেড (আর, আই, আর)

আমেরিকার রোড আইল্যান্ড নামক স্থানে এ জাতের মুরগি প্রথম পাওয়া যায়। এদের পালকের রং কালচে লাল। মাংস ও ডিমের জন্য এই মুরগি পালন করা হয়। বছরে এরা আমাদের দেশে ১৫০-২০০টি পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। এদের ডিমের রং বাদামি। এ জাতের মুরগির ওজন ২-৩ কেজিরও বেশি হয়ে থাকে।



রোড আইল্যান্ড রেড (আর আই আর)

## ফাইগমি

মিশরে এদের আদি বাসভূমি। এ মুরগি দেখতে অনেকটা আমাদের দেশি মুরগির মত। পালকের রং সাদা কালো মিশ্রিত। বছরে এরা আমাদের দেশে ১৫০-২০০টি পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। আমাদের গ্রামীণ পরিবেশের জন্য ফাইগমি বেশ উপযোগী।



ফাইগমি

## হাঁস

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পোষার উপযোগী। নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর, ডোবায় সহজে হাঁস পালন করা যায়। আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের হাঁস পাওয়া যায়, যেমন-(১) দেশি হাঁস (২) উন্নত জাতের হাঁস।

## দেশি হাঁস

দেশি হাঁসের গায়ের রং মিশ্র। এরা বছরে ৬০-৮০টি ডিম দিয়ে থাকে। সিলেটের নাগেশ্বরী জাতের হাঁস হালকা নীল রঙের ডিম দিয়ে থাকে।



## উন্নত জাতের হাঁস

### খাকি ক্যাম্পবেল

খাকি ক্যাম্পবেল ডিমের জন্য বিখ্যাত। মিসেস ক্যাম্পবেল নামক এক মহিলা বিলাতে এই জাত উদ্ভাবন করেন। মিসেস ক্যাম্পবেলের নামানুসারে এবং গায়ের রং খাকি হওয়ায় এ হাঁসের নামকরণ করা হয়েছে খাকি ক্যাম্পবেল। এরা বছরে ২০০-২৫০টি ডিম দিয়ে থাকে।



খাকি ক্যাম্পবেল

### ইন্ডিয়ান রানার

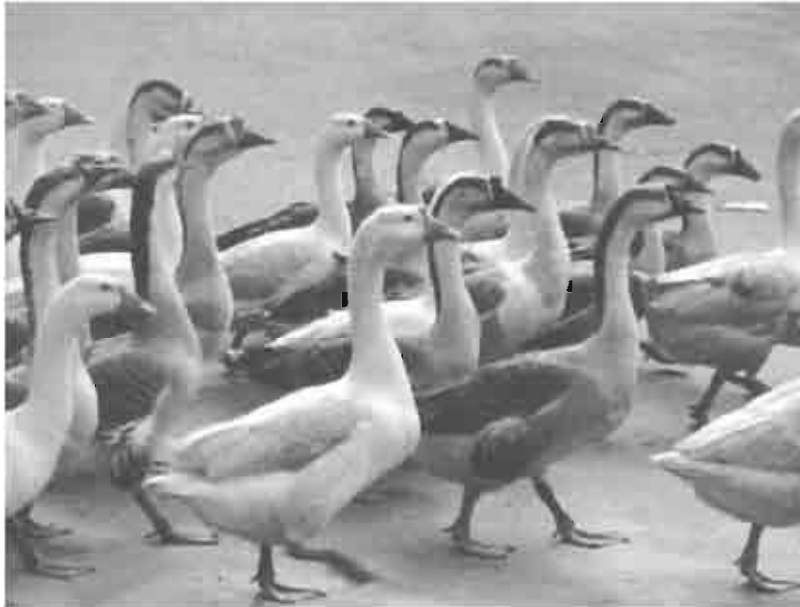
ইন্ডিয়ান রানার হাঁস ডিম উৎপাদনের জন্য সুপরিচিত। এরা বছরে ২০০টির বেশি ডিম দিয়ে থাকে। এদের গলা লম্বা এবং গায়ের রং সাধারণত সাদা হয়ে থাকে। ডিমের জন্য বর্তমানে অনেক দেশেই এ জাতের হাঁস পালন করা হয়।



ইন্ডিয়ান রানার

### রাজহাঁস

সাদা ও ধূসর এই দুই রঙের রাজহাঁস আমাদের দেশে পাওয়া যায়। ওজনে গড়ে এরা ৬ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। রাজহাঁস সবুজ ঘাস ও শাকসবজি খেতে পছন্দ করে। বছরের এরা মাত্র ২০-৩০টি ডিম দিয়ে থাকে। সৌখিন লোকেরা এ হাঁস পুষে থাকে।



রাজহাঁস

## তিতির

তিতির খুবই সুন্দর পাখি। এদের পালকের রং ধূসর এবং সাদা কালো ফোটা ফোটা। বছরে এরা মাত্র ৪০-৭০টি ডিম দিয়ে থাকে। এরা লুকিয়ে ডিম পাড়তে পছন্দ করে। সৌখিন লোকেরা সাধারণত এদের পুষে থাকে।



তিতি

## কবুতর

গৃহপালিত পাখির মধ্যে কবুতর আমাদের অতি পরিচিত। কবুতর শান্তির প্রতীক। কবুতরের বাচ্চার মাংস খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। একজোড়া কবুতর হতে প্রতি দেড় মাসে গড়ে ২টি বাচ্চা পাওয়া যায়। কবুতরের জাতের মধ্যে গিরিবাজ, সিরাজী, লোটন, ময়ূরপঙ্খী, সিলভার কিং ও হোয়াইট কিং উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের জালালী কবুতর বিশেষভাবে পরিচিত। প্রাচীনকালে চিঠি আদান-প্রদান ও ক্রীড়া প্রদর্শনীতে কবুতর ব্যবহার হতো। কবুতর পালন লাভজনক।



কবুতর

## কোয়েল

কোয়েল পাখি দেখতে বেশ সুন্দর। ছয় থেকে সাত সপ্তাহ বয়সে এরা ডিম দেওয়া শুরু করে। বছরে ২৫০-৩০০টি ডিম দিয়ে থাকে। একটি কোয়েল পাখির ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম এবং ডিমের ওজন ৮-১০ গ্রাম। এদের মাংস ও ডিম খুব সুস্বাদু।



কোয়েল

## ব্যবহারিক

বিষয় : বিভিন্ন পাখির পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ

### উপকরণ

মুরগি, হাঁস, কবুতর

### পদ্ধতি

- ১। দলবদ্ধভাবে বা একজন করে পাখির নিকট যাও এবং পর্যবেক্ষণ কর।
- ২। পাখির বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ কর।
- ৩। বইয়ের ছবির সাথে মিলিয়ে পাখির বৈশিষ্ট্যগুলো দেখ।
- ৪। শিক্ষকের সাহায্যে বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝে নাও।
- ৫। ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় বিষয়গুলো লেখ।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. দেশি মুরগির পালকের রং কী ?  
ক. লাল  
খ. সাদা  
গ. কালো  
ঘ. মিশ্র বর্ণের
২. অস্ট্রাল্প মুরগি বছরে কতগুলো ডিম দিয়ে থাকে ?  
ক. ৪০ - ৬০টি  
খ. ৮০ - ১০০টি  
গ. ১৫০ - ২০০টি  
ঘ. ২০০ - ৩০০টি
৩. রোড আইল্যাণ্ড রেড মুরগি কোন দেশি জাত ?  
ক. আমেরিকা  
খ. মিশর  
গ. ইতালি  
ঘ. ভারত
৪. লেয়ার মুরগির খামারের জন্য কোন জাতটি লাভজনক ?  
ক. দেশি মুরগি  
খ. হোয়াইট লেগহর্ন  
গ. অস্ট্রাল্প  
ঘ. ফাইওমি
৫. হাঁস চাষ লাভজনক কারণ-  
i. বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পোষার উপযোগী  
ii. পুকুর ডোবায় সহজে হাঁস পালন করা যায়  
iii. তুলনামূলকভাবে কম খাবার দিতে হয়

### নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাহবুবা বেগম সিলেটের নাগেশ্বরী জাতের দেশি হাঁস পালন করেন। কিন্তু আশানুরূপ ডিম না পাওয়ায় তিনি উন্নত জাতের খাকি ক্যাম্পবেল নামক হাঁস পালন করার চিন্তা ভাবনা করেছেন।

৬. সিলেটের নাগেশ্বরী জাতের হাঁসের ডিমের রং কী ?  
ক. বাদামী  
খ. মিশ্র বর্ণের  
গ. হালকা নীল  
ঘ. সাদা
৭. সাধারণত নাগেশ্বরী জাতের হাঁস বছরে কয়টি ডিম দেয় ?  
ক. ৬০ - ৮০  
খ. ৮০ - ১০০  
গ. ১০০ - ১২০  
ঘ. ১২০ - ১৪০
৮. মাহবুবা বেগমের নাগেশ্বরী জাত অপেক্ষা খাকি ক্যাম্পবেল পালন লাভজনক হবে কেন ?  
ক. খাদ্য খরচ কম বলে  
খ. অধিক ডিম দেয় তাই  
গ. যে কোন পরিবেশে খাপ খায়  
ঘ. কম জায়গা লাগবে বলে

### সৃজনশীল প্রশ্ন

রফিক ভাড়া বাড়িতে থাকে। তার বাড়ির ছাদে সে কোয়েলের ফার্ম তৈরি করল। তার ফার্মে ২৫ জোড়া কোয়েল রয়েছে। এই ফার্ম থেকেই তার পরিবারের আমিষের চাহিদা মেটে। বাড়ির চাহিদা মিটিয়েও সে অতিরিক্ত ডিম বাইরে বিক্রি করে।

- ক. কোয়েল কী ?
- খ. কোয়েলের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
- গ. রফিক তার ফার্ম থেকে বছরে কতটি ডিম পেতে পারে তা নির্ণয় করে দেখাও।
- ঘ. রফিক মুরগির ফার্ম না করে কোয়েলের ফার্ম করলো কেন তা ব্যাখ্যা কর।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### গৃহপালিত পাখির খাদ্য

অন্যান্য প্রাণীর মত গৃহপালিত পাখিরও বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। খাদ্যের কাজ এবং খাদ্যের উপাদান সম্পর্কে গবাদি পশুর খাদ্য অংশে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। গৃহপালিত পাখির খাদ্য সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১। গম, ভুট্টা ভাঙা ও চাউলের কুঁড়া শর্করাজাতীয় খাদ্য।

২। শূটকী মাছের গুঁড়া, তিল, চিনাবাদাম বা সয়াবিন খৈল আমিষজাতীয় খাদ্য।

৩। মাছের তেলে ভিটামিন ও চর্বি থাকে।

৪। শাকসবজি ও হলুদ ভুট্টায় প্রচুর ভিটামিন থাকে।

৫। ঝিনুক চূর্ণ, চুনাপাথর ভাঙা, হাড়ের গুঁড়া ও লবণে খনিজ পদার্থ থাকে।

হাঁস মুরগির খাদ্যে তাই নিম্নরূপ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়। যথা—

১। গম ও ভুট্টা ভাঙা, ২। চাউলের কুঁড়া, ৩। শূটকী মাছের গুঁড়া, ৪। খৈল, ৫। লবণ,

৬। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ৭। ঝিনুক চূর্ণ বা চুনাপাথর ভাঙা, ৮। হাড়ের গুঁড়া।

এখানে পরিমাণসহ হাঁস-মুরগির একটি গড় খাদ্য তালিকা উল্লেখ করা হল :

১। গম ও ভুট্টা ভাঙা	৪.৫ কেজি
২। চাউলের কুঁড়া	৩.০ কেজি
৩। শূটকী মাছের গুঁড়া	১.০ কেজি
৪। খৈল	১.২ কেজি
৫। ঝিনুক চূর্ণ বা চুনাপাথর ভাঙা	২০০ গ্রাম
৬। লবণ	৫০ গ্রাম
৭। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ	২৫ গ্রাম
৮। হাড়ের গুঁড়া	২৫ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

এই খাদ্য উপকরণের পরিমাণ বিভিন্ন বয়সের পাখির জন্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ঝিনুক, শামুক, ছোট মাছ, কাঁকড়া, কেঁচো, পোকা-মাকড়, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি হাঁসের প্রিয় খাদ্য।

### ব্যবহারিক

#### বিষয় : মুরগির খাবারের সাথে পরিচিতি

##### উপকরণ

এ পরিচ্ছেদের বর্ণিত হাঁস-মুরগির খাবারের উপকরণসমূহ।

##### কাজের ধাপ

১। খাদ্যের উপকরণগুলো শনাক্ত করে আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখ।

২। হাঁস-মুরগির খাদ্যের উপকরণগুলো দেখ। শিক্ষকের সাহায্যে খাদ্যের কাজ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা কর।

৩। হাঁস-মুরগির খাদ্য তৈরি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। ব্যবহারিক খাতায় বিবরণী লেখ।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মাছের তেল কোন জাতীয় খাদ্য ?

- |            |           |
|------------|-----------|
| ক. আমিষ    | খ. শর্করা |
| গ. ভিটামিন | ঘ. চর্বি  |

২. মুরগির খাদ্যে খনিজ পদার্থের উৎস—

- কিনুক চূর্ণ
- শুটকির গুঁড়া
- শামুকের গুঁড়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশে প্রতিবছর সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলার কারণে বহু হাঁস-মুরগি মারা যায়। তাই নন্দনপুর থানার পশু ডাক্তার এলাকার খামার মালিকদের নিয়ে হাঁস-মুরগির রোগ দমন ও প্রতিরোধ বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করেন। কর্মশালায় মুরগির আদর্শ ঘরের পরিবেশসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

৩. স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে মুরগির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ডাক্তারের কোন বক্তব্যটি সত্য?

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| ক. স্বাস্থ্য ভালো থাকে | খ. রোগ ব্যাধি বেশি হয়         |
| গ. অপুষ্টিজনিত রোগ হয় | ঘ. মুরগি ঠান্ডা ও আরাম বোধ করে |

৪. উল্লিখিত কর্মশালায় নিম্নলিখিত কোন বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ?

- হাঁস-মুরগিকে সুস্বাদু খাদ্য প্রদান
- হাঁস-মুরগির সংস্কার
- সুস্থ হাঁস-মুরগিকে সংক্রামক রোগের টিকা প্রদান
- হাঁস-মুরগির ঘরে আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা

### সৃজনশীল প্রশ্ন

শ্রীপুর গ্রামের জাহিদ কয়েক বছর যাবৎ মুরগির খামার করে অনেক টাকা আয় করেছে। এ উৎসাহ থেকেই এ বছর তার খামারে ৫০০ মুরগি আছে এবং তাদের জন্য দৈনিক ২০ কেজি পরিমাণ সুস্বাদু খাদ্য প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে হঠাৎ মুরগির খাদ্য উপাদানের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়।

- খাদ্য কাকে বলে ?
- মুরগির কোন খাদ্য উপাদান বেশি লাগে তা বর্ণনা কর ?
- বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ও পরিমাণ উল্লেখপূর্বক জাহিদের খামারের জন্য একটি দৈনিক গড় খাদ্য তালিকা প্রস্তুত কর।
- খাদ্য উপাদানের মূল্য বৃদ্ধি জাহিদের মুরগির খামারের ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে তা ব্যাখ্যা কর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### হাঁস-মুরগির রোগ

আমাদের দেশে প্রতি বছর অনেক হাঁস-মুরগি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। হাঁস-মুরগি পুষে লাভবান হতে হলে এদেরকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। হাঁস-মুরগি সাধারণত নিম্নে বর্ণিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

#### মুরগির রোগ

১। রানীক্ষেত, ২। বসন্ত, ৩। গামবোরো, ৪। কলেরা, ৫। রক্ত আমাশয়, ৬। কৃমি, ৭। উকুন

#### হাঁসের রোগ

১। কলেরা, ২। ডাক প্লেগ

এছাড়াও সুস্থ খাবারের অভাব হলে হাঁস-মুরগি অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে।

হাঁস-মুরগির রোগ ব্যাধি যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে সহজেই এদেরকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। হাঁস-মুরগির রোগ দমন ও প্রতিরোধের জন্য নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

- (১) হাঁস-মুরগির ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- (২) হাঁস-মুরগি থাকার জায়গা সব সময় শুকনা রাখা প্রয়োজন। করাতির গুঁড়া, ধানের তুষ এবং ছাই মেঝেতে লিটার বা বিছানা হিসেবে ব্যবহার করে ঘর শুকনা রাখা যেতে পারে। স্যাঁতসেঁতে বস্তু ঘরে রোগ ব্যাধি বেশি হয়।
- (৩) হাঁস-মুরগি সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- (৪) হাঁস-মুরগির পরিষ্কার পানি ও সুস্থ খাদ্য দিতে হবে।
- (৫) বাজার থেকে কিনে আনা হাঁস-মুরগি ৫-৭ দিন পৃথক জায়গায় রাখতে হবে।
- (৬) হাঁস-মুরগি অসুস্থ হবার সাথে সাথে আলাদা করতে হবে।
- (৭) অসুস্থ হাঁস-মুরগি বাজারে বিক্রয় করা ঠিক নয়।
- (৮) রোগাক্রান্ত হাঁস-মুরগির ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।
- (৯) অসুস্থ হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ও লালা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়।
- (১০) সুস্থ হাঁস-মুরগিকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে।
- (১১) হাঁস-মুরগিকে মাঝে মাঝে কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে।
- (১২) মৃত হাঁস-মুরগিকে মাটির নিচে পুঁতে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

## ব্যবহারিক

বিষয় : হাঁস-মুরগির বাসস্থান পরিচিতি

#### উপকরণ

স্কুলে অথবা স্কুলের পার্শ্ববর্তী কোন খামার বা কৃষকের বাড়ি।

ফর্ম-১০ কৃষি-৬ষ্ঠ

### কাজের ধাপ

- ১। শিক্ষকের সাথে হাঁস-মুরগির খামারে যাও।
- ২। হাঁস-মুরগির বাসস্থানের আকার, আকৃতি পর্যবেক্ষণ কর।
- ৩। শিক্ষকের সাথে আলোচনাক্রমে স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান সম্পর্কে জেনে নাও।
- ৪। লিটারে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যেমন করাভের গুঁড়া, ধানের তুষ, ছাই দেখ এবং ব্যবহার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ কর।
- ৫। খাবার ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা লক্ষ কর।
- ৬। বিষয়টি ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লেখ।

### বিষয় : হাঁস-মুরগির রোগ সম্বন্ধে পরিচিতি

#### উপকরণ

- (১) হাঁস-মুরগির বিভিন্ন টিকা
- (২) রোগাক্রান্ত হাঁস-মুরগি।

### কাজের ধাপ

- ১। শিক্ষকের সাথে স্কুলের খামারে, নিকটবর্তী পশু হাসপাতালে অথবা কৃষকের খামারে যাও।
- ২। হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ লক্ষ কর।
- ৩। হাঁস-মুরগির রোগের টিকা লক্ষ কর।
- ৪। হাঁস-মুরগির টিকা দেওয়া দেখ।
- ৫। শিক্ষকের সঙ্গে এবং খামার মালিকের সাথে হাঁস-মুরগির রোগ এবং টিকা ও মৃত পাখির সৎকার সম্পর্কে আলোচনা কর।
- ৬। ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লেখ।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. অসুস্থ হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ও লালা কী করতে হয় ?
 

ক. মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়	খ. ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে হয়
গ. পুকুরের পানিতে ফেলতে হয়	ঘ. ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে ফেলতে হয়
২. হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন
  - i. মৃত হাঁস-মুরগি মাটিতে পুঁতে ফেলা
  - ii. অসুস্থ মুরগিকে সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়া
  - iii. হাঁস-মুরগিকে পরিষ্কার পানি ও সুস্বাদু খাদ্য দেওয়া

### নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ - ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

জয়নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী একটি মুরগির খামার পরিদর্শনে গেল। তারা দেখল খামারের বেশ কয়েকটি মুরগি ঘনঘন পায়খানা করছে। পশু ডাক্তার সুস্থ মুরগিগুলোকে টিকা দিচ্ছেন। খামারের মালিককে তারা খুবই চিন্তিত দেখলেন।

৩. খামারের অসুস্থ মুরগিগুলো কোন রোগে আক্রান্ত?

ক. রানীক্ষেত

খ. বসন্ত

গ. কলেরা

ঘ. গামবোরো

৪. ডাক্তার সাহেব মুরগিগুলোকে টিকা দিলেন কেন?

ক. মুরগিগুলোকে সুস্থ করার জন্য

খ. রোগ দমন ও প্রতিরোধের জন্য

গ. মুরগির শরীরের পুষ্টি পূরণ করলে

ঘ. টিকা দেওয়ার রেওয়াজ বজায় রাখার জন্য

৫. সুস্থ মুরগিগুলো যাতে রোগাক্রান্ত না হয় সেজন্য মালিকের করণীয়-

ক. অসুস্থ ও সুস্থ মুরগিকে টিকা দেওয়া

খ. মুরগিগুলোকে শুকনা জায়গায় রাখা

গ. অসুস্থ মুরগিগুলোকে দ্রুত বাজারে বিক্রয় করা

ঘ. অসুস্থ মুরগিগুলোকে আলাদা করে ফেলা

### সৃজনশীল প্রশ্ন

নুরুর পারিবারিক মুরগির খামারে ২৫টি মুরগি আছে। হঠাৎ মুরগিগুলো কলেরা রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করলে সে সংক্রামক রোগের টিকা দেয়। এতে রোগ দমিত না হয়ে কিছু মুরগি মারা যায়। এমতাবস্থায় পশু ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার মৃত মুরগিগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলতে বললেন। তিনি মুরগি পালনে সুষম খাদ্যের পরামর্শ দেন। ফলে খামারটি লাভজনক হয়।

ক. সংক্রামক রোগ কী?

খ. মুরগিকে টিকা দেওয়া হয় কেন?

গ. নুরু কীভাবে বুঝতে পারল যে তার খামারের মুরগিগুলো কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল?

ঘ. কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে নুরুর খামারের মুরগিগুলো রোগাক্রান্ত হত না?



ষষ্ঠ অধ্যায়  
**গৃহপালিত পশু পালন**  
প্রথম পরিচ্ছেদ  
**গৃহপালিত পশুর পরিচিতি**

পৃথিবীতে বহু ধরনের পশু রয়েছে। এদের সবই গৃহপালিত পশু নয়। গৃহে পালন করার উপযোগী উপকারী পশুকে গৃহপালিত পশু বলা হয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে মানুষ বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহে পালন করতে শুরু করেছে। প্রথম পোষ মানা পশু হল কুকুর ও ছাগল। এরপর পর্যায়ক্রমে শূকর, ভেড়া, গরু, ঘোড়া, গাধা ও মহিষ গৃহপালিত পশুর তালিকায় এসেছে। আমাদের দেশে গৃহপালিত পশু বলতে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে বুঝায়। অনেকে শখ করে বিড়াল ও কুকুর পুষে থাকে।

### গরু

আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরুই প্রধান। এদেশে প্রতিটি গ্রামে কৃষক পরিবারে গরু পালন করা হয়ে থাকে। আজকাল শহর এবং শহরতলি এলাকায়ও গরু পালন করা হয়, এসব এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও অনেক গরুর খামার গড়ে উঠছে।

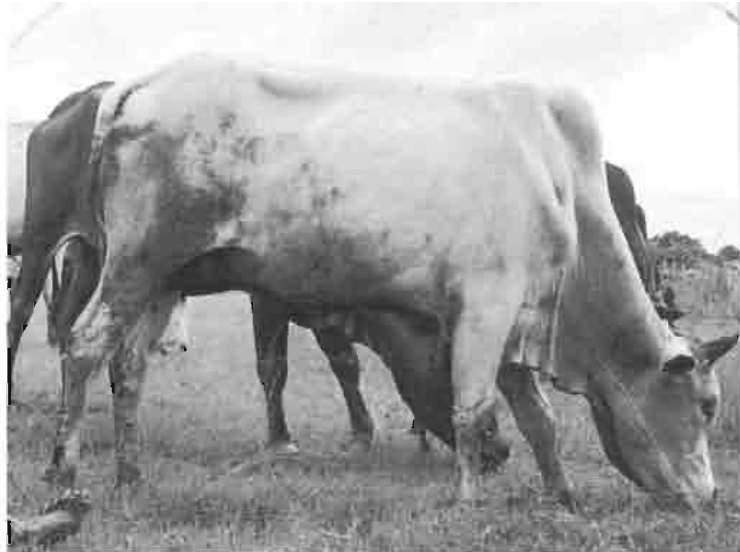
বিভিন্ন বয়সে গরু বিভিন্ন নামে পরিচিত। গরুর বাচ্চাকে বলা হয় বাছুর। পুরুষ বাচ্চাকে বলা হয় ঐঁড়ে বাছুর। বড় হলে এগুলোকে বলা হয় ষাঁড়। আবার ঐঁড়ে বাছুরকে বলদও করা যায়। বলদ সাধারণত হালচাষ, গাড়ি টানা, শস্য মাড়াই ও তেলের ঘানি টানার কাজে ব্যবহৃত হয়। স্ত্রী বাচ্চাকে বকনা বাছুর বলা হয়। বাচ্চা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এদেরকে বকনা বলা হয়। বাচ্চা দেওয়ার পর এদেরকে গাভী বলা হয়।

জাত হিসেবে গরুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

১। দেশি জাতের গরু, ২। বিদেশি উন্নত জাতের গরু, ৩। উন্নত সংকর জাতের গরু

### দেশি জাতের গরু

আমাদের দেশে অধিকাংশ গরুই দেশি জাতের। আকারে ছোট হয়। একটি প্রাপ্তবয়স্ক গরুর ওজন গড়ে ১৫০ কেজি



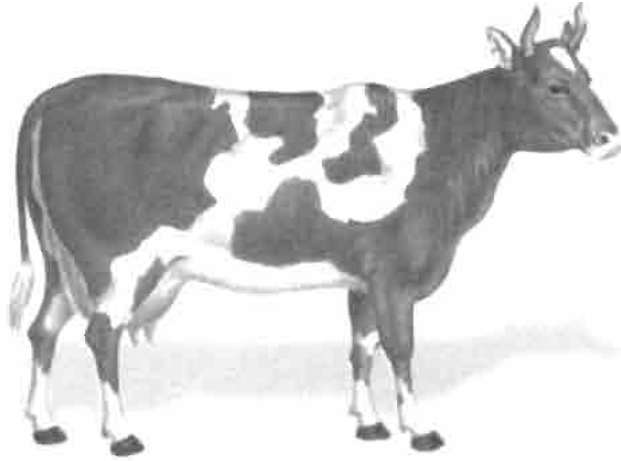
দেশি গরু

হয়ে থাকে। দেশি জাতের গরুর কুঁজ উঁচু হয়। একটি দেশি জাতের গাভী হতে দৈনিক ১-৩ লিটার দুধ পাওয়া যায়। এদের কাজ করার ক্ষমতাও কম। দেশি জাতের গরুর মধ্যে চটগ্রাম এলাকার রেড চিটাগাং নামের গরু আছে। পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর ও ঢাকার কোনো কোনো এলাকায় দেশি জাতের একটু বড় আকারের গরু পাওয়া যায়। এগুলো থেকে দুধ কিছু বেশি পাওয়া যায়। একটি দেশি বকনা প্রথম বাচ্চা দিতে ৪ বছর পর্যন্ত সময় লাগে।

### বিদেশি উন্নত জাতের গরু

আমাদের দেশে এখন বিদেশি উন্নত জাতের গরু পাওয়া যাচ্ছে। এসব গরু বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। বিদেশি উন্নত জাতের গরু যেমন হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান ও শাহিওয়াল আমাদের দেশে পাওয়া যায়। সরকারি খামারে এসব গরু হতে উন্নত জাতের গরু উৎপাদন করা হচ্ছে।

**হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান জাতের গরু :** এ জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য—



ফ্রিজিয়ান গরু

এরা আকারে অনেক বড় হয়। এদের কুঁজ উঁচু হয় না। এদের গায়ের রং সাধারণত সাদা কালো মিশ্রিত। একটি গাভীর ওজন ৫০০-৬০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। একটি ষাঁড়ের ওজন ৮০০ কেজিরও বেশি হয়ে থাকে। একটি গাভী দিনে ৪০ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়। বাচ্চা দেওয়ার পর থেকে পরবর্তী বাচ্চা প্রদান পর্যন্ত একটানা দুধ দিতে থাকে। এ জাতের বকনা আড়াই বৎসর বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয় এবং প্রতি বছরই বাচ্চা দেয়।

**শাহিওয়াল জাতের গরু :** এ জাতের গরু পাকিস্তান থেকে আমাদের দেশে আনা হয়েছে। এরা আকারে দেশি জাত থেকে অনেক বড় হয়। এদের গায়ের রং তামাটে। কাঁধে বড় কুঁজ হয়। বকনার প্রথম বাচ্চা দিতে ৩-৩½ বছর লেগে যায়।

এ জাতের একটি গাভী হতে দৈনিক ১৫ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়।



শাহিওয়াল গরু

**উন্নত সংকর জাতের গরু :** বিভিন্ন জাতের ষাঁড় ও গাভীর মিশ্রণে যে নতুন জাতের গরু পাওয়া যায় তাকে সংকর জাতের গরু বলে। উন্নত সংকর জাতের গরু পালন আমাদের দেশের আবহাওয়ায় উপযোগী। তাই, আমাদের দেশে সংকর জাতের গরুর প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

সংকর জাতের গরু দেশি গরুর চেয়ে আকারে অনেক বড় হয়। এরা দেশি গাভীর চেয়ে অনেক বেশি দুধ দেয়। একটি সংকর জাতের গাভী হতে দৈনিক সর্বোচ্চ ১০-২০ লিটার দুধ পাওয়া যায়। এদের থেকে মাংসও বেশি পাওয়া যায়। এরা দেশি গরু অপেক্ষা বেশি কাজ করতে পারে।

## মহিষ

বাংলাদেশের সব এলাকাতেই মহিষ পালন করা হয়ে থাকে। নদীর চর এলাকায়, সমুদ্র উপকূল এলাকায়, দ্বীপাঞ্চলে ও হাওর এলাকায় মহিষ পালন করা হয় বেশি। মহিষ গরু থেকে আকারে বড় হয়। আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের মহিষ পালন করা হয়ে থাকে, যেমন—

১. দেশি জাতের মহিষ

২. উন্নত জাতের মহিষ।

**দেশি জাতের মহিষ :** এরা কাদা পানিতে শরীর ডুবিয়ে রাখতে পছন্দ করে। এ জাতের মহিষের গায়ের রং কালচে হয়। এদের শিং বেশ লম্বা ও চ্যাপ্টা হয়। এদের থেকে দুধ পাওয়া যায় কম। এরা বেশি কর্মঠ হয়। মহিষ হালচাষ ও পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হয়।



দেশি মহিষ

**উন্নত জাতের মহিষ :** এ জাতের মহিষ পরিষ্কার পানিতে শরীর ডুবিয়ে রাখতে পছন্দ করে। এদের গায়ের রং কালো। এরা আকারে দেশি জাতের মহিষ থেকে বড় হয়। এ জাতের মহিষের শিং ছোট এবং পিছনের দিকে বাঁকানো হয়। উন্নত জাতের মহিষের মধ্যে নিলিরাভি ও মুরা জাত প্রসিদ্ধ। এ জাতের মহিষ পাকিস্তান ও ভারত থেকে আমাদের দেশে আনা হয়েছে। এরা দুধ দেয় বেশি। একটি মহিষ থেকে দৈনিক ২৫ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়।

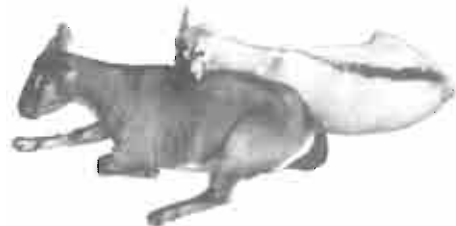
## ছাগল পালন

আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছাগল অন্যতম। এ দেশে গ্রামে প্রায় পরিবারেই ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। এ প্রাণী খুবই শান্তশিষ্ট। ছাগল ছোট প্রাণী। ছোট খামার এবং বসতবাড়িতে অল্প খরচে এদের পালন করা যায়।

## ছাগলের ধরন

আমাদের দেশে প্রধানত ২ ধরনের ছাগল পাওয়া যায়। যেমন—

১। দেশি জাতের ছাগল, ২। বিদেশি জাতের ছাগল



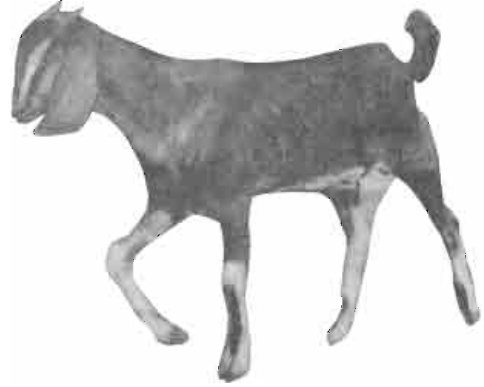
দেশি ছাগল

## দেশি জাতের ছাগল

দেশি জাতের ছাগলের মধ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বিশ্ববিখ্যাত। বাংলাদেশে বেঙ্গল জাতের ছাগলের মধ্যে কালো ছাগলের সংখ্যাই বেশি। এজন্য একে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বলে। তবে মিশ্রভাবে সাদা ও বাদামি রঙের ছাগল আমাদের দেশে রয়েছে। এই ছাগলের মাংস ও চামড়া উন্নত মানের হয়। বিদেশে আমাদের দেশের ছাগলের চামড়ার চাহিদা বেশি। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের দুধ খুবই সুস্বাদু ও আমিষ সমৃদ্ধ।

## বিদেশি জাতের ছাগল

আমাদের দেশে বিদেশি জাতের ছাগলও পাওয়া যায়। বিদেশি ছাগলের মধ্যে যমুনাপাড়ি ছাগল উল্লেখযোগ্য। এ জাতের ছাগলের উৎপত্তি ভারতে। এরা রামছাগল নামে পরিচিত। এরা আকারে বড় হয়। পা ও কান লম্বা। কান ঝুলান থাকে। এসব জাতের ছাগলের রং প্রধানত বাদামি-ধূসর। এরা বেশি দুধ দেয়।



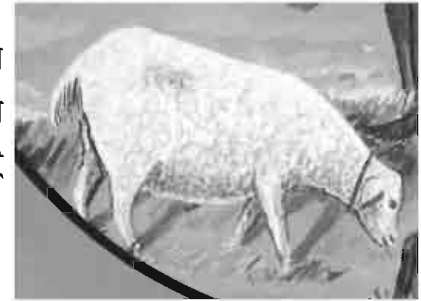
যমুনাপাড়ি ছাগল

## ছাগলের অবদান

সঠিকভাবে ছাগল পালন করে আমরা আমাদের আমিষের চাহিদা পূরণ করতে পারি। ছাগলের চামড়া, মাংস ও দুধজাত খাদ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বাংলাদেশের কৃষক সমাজের উন্নয়নে ছাগল পালন অনেক অবদান রাখতে পারে।

## ভেড়া

আমাদের দেশে ছাগলের মতো ভেড়া পালন ততো প্রচলিত নয়। দেশের সব এলাকায় কমবেশি ভেড়া পালন করা হয়। তবে সমুদ্র উপকূল ও রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকায় ভেড়া বেশি পালন করা হয়। এদের চামড়া এবং পশম খুবই দরকারি। আমাদের দেশে দেশি জাতের ভেড়া প্রতিপালন করা হয়ে থাকে।



ভেড়া

## ব্যবহারিক

বিষয় : পশুর বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিতি

## উপকরণ

### গরু

১. দেশি গরু ২. সংকর জাতের গরু

## ছাগল

- ১) দেশি ছাগল, ২) রামছাগল

এসব পশু বিদ্যালয়ে, নিজের বাড়িতে, পাশের বাড়িতে বা গ্রামের যে কোন বাড়িতে পাওয়া যাবে।

## কাজের ধাপ

- ১) দেশি গরুর বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে দেখে খাতায় লেখ। উন্নত সংকর জাতের গরুর বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে খাতায় লেখ।  
২) দেশি জাতের ছাগলের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে খাতায় লেখ। রামছাগলের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখ। রামছাগল পাওয়া না গেলে দেশি জাতের ছাগলের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ কর।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মানুষের প্রথম পোষা পশুগুলো হল-  
ক. গরু ও ঘোড়া  
খ. শূকর ও ভেড়া  
গ. গাধা ও মহিষ  
ঘ. কুকুর ও ছাগল
২. দেশি জাতের মহিষের বৈশিষ্ট্যগুলো হল -  
i. শিং বেশ লম্বা ও চ্যাপ্টা হয়  
ii. বেশি দুধ দেয়  
iii. বেশি কর্মঠ হয়

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii  
খ. ii ও iii  
গ. i ও iii  
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ - ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

হালিমা তার সংসারের স্বচ্ছলতা আনার জন্য একটি ছোট আকারের গরুর খামার গড়ে তোলে। তার খামারে ১০টি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা গরু আছে। গরুগুলোর বয়স  $1\frac{1}{2}$  বছর থেকে ২ বছরের মধ্যে।

৩. হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী -  
ক.  $3\frac{1}{2}$  বছরে প্রথম বাচ্চা দেয়  
খ.  $2\frac{1}{2}$  বছরে প্রথম বাচ্চা দেয়  
গ. ২ বছরে প্রথম বাচ্চা দেয়  
ঘ.  $1\frac{1}{2}$  বছরে প্রথম বাচ্চা দেয়



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব খুব বেশি। হালচাষ ও গ্রামীণ পরিবহণ গরু ও মহিষের ওপর নির্ভরশীল। গৃহপালিত পশুর মাংস উৎকৃষ্ট খাদ্য। দুধ ও দুধ হতে তৈরি খাদ্যও খুব উপাদেয়। পশুর মলমূত্র উৎকৃষ্ট জৈব সার। এছাড়াও পশু হতে হাড়, নাড়িভুঁড়ি ও চর্বি পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশু পালন জীবিকা নির্বাহের একটি প্রধান উপায়।

#### পরিবহণ ও অন্যান্য

##### হালচাষ

আমাদের দেশে গরু মহিষের দ্বারা হালচাষ করা হয়। আবাদযোগ্য জমির প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই গরু ও মহিষ দ্বারা চাষ করা হয়। ফসল সংগ্রহ ও মাড়াই কাজে গরু ও মহিষ ব্যবহার করা হয়। গুড় বানানোর জন্য এবং আখ মাড়াই কাজেও গরু মহিষ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কৃষি পণ্য হাটবাজার, কলকারখানাসহ বিভিন্ন স্থানে পরিবহণের জন্য গরু মহিষের গাড়ি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দেশের বহু স্থানে মানুষের যানবাহন হিসেবে গরু মহিষের গাড়ি এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রামে ঘানি টানার জন্য গরু মহিষ ব্যবহৃত হচ্ছে।



গরু দিয়ে হালচাষ

##### দুধ

দুধ মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য। দুধে মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য উপাদান বিদ্যমান। দুধ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য যেমন মিষ্টি, ছানা, ঘি, মাখন, পনির, দধি, মাঠা, ক্ষির, পায়ের ইত্যাদি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু।



মহিষ দিয়ে গাড়ি টানা

##### মাংস

মাংস আমাদের প্রিয় খাদ্য। প্রাণিজ আমিষের একটি প্রধান উৎস মাংস। মাংস মানুষের শরীর গঠন ও বৃদ্ধির জন্য দরকারি। বাংলাদেশে গরু ও ছাগলের মাংস জনপ্রিয়।

##### রক্ত ও নাড়িভুঁড়ি

আমাদের দেশে পশু জবাইয়ের পর রক্ত এবং নাড়িভুঁড়ি যেখানে সেখানে ফেলার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কিন্তু এগুলো ফেলে দেওয়া ঠিক নয়। পশুর নাড়িভুঁড়ি ও রক্ত মুরগি ও পশুর খাদ্য হিসেবে উৎকৃষ্ট। কারণ এগুলোতে প্রচুর আমিষ থাকে যা পশু খাদ্যে প্রয়োজন।

## চর্বি

পশুর মাংসে চর্বি থাকে। পশুর চর্বি সাবান তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।

## গোবর

গৃহপালিত পশুর মলমূত্র জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করে জ্বালানি এবং বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। গ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট অংশ জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

## চামড়া, পশম, হাড় ও শিং

গৃহপালিত পশুর কোন অংশই ফেলে দেওয়ার নয়। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া হতে মাংস, চামড়া, পশম, হাড় ও শিং ইত্যাদি পাওয়া যায়। চামড়া দিয়ে সুটকেস, ব্যাগ, জুতা, বেল্ট, পোশাক, দস্তানা তৈরি করা হয়। চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ভেড়ার পশম থেকে বিভিন্ন ধরনের কম্বল ও গরম পোশাক তৈরি করা হয়। হাড় দিয়ে উৎকৃষ্ট সার তৈরি করা হয়। হাড়ের গুঁড়া পশু পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গরু মহিষের শিংও মূল্যবান সম্পদ। শিং দিয়ে চিরুনি, অলংকার ও খেলনা তৈরি করা হয়।

## আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ

আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব অনেক। গৃহপালিত পশু পালন করে বিভিন্নভাবে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বাড়ান যায়। উন্নত সংস্কর জাতের গাভী পালন করে প্রচুর দুধ উৎপাদন করা যায়। এই দুধ বিক্রি করেও প্রচুর টাকা আয় করা যায়। বাড়িতে ষাঁড় বা বলদ মোটাতাজা করে বাজারে বিক্রি করলে অল্প সময়ে ভালো আয় হয়। ছাগল, ভেড়া পালনও লাভজনক। কম পুঁজিতে ছাগল ভেড়া পালন করা যায়। গ্রামের গরিব বেকার যুবক, মহিলা ও স্কুল কলেজগামী ছেলেমেয়েরা ছাগল পালন করে আয় বাড়াতে পারে।

গৃহপালিত পশু পালন দ্বারা বিভিন্নভাবে বেকারত্ব দূর করে আর্থিক উন্নয়ন করা যায়। যেমন—

- (১) গরু মহিষের গাড়ি ব্যবহার করে কর্মসংস্থান হয়।
- (২) দুধ হতে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যেমন মিষ্টি, দই, ছানা, মাখন প্রস্তুতকরণে বহু লোক কাজ করছে।
- (৩) গরু মহিষ দিয়ে ঘানি টানা, আখ মাড়ানোর কাজের মাধ্যমে বহু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।
- (৪) মাংস ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।
- (৫) চামড়া শিল্পে বহু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।
- (৬) চর্বি ব্যবহার করে সাবান উৎপাদন শিল্পে বহু লোক কাজ করছে।
- (৭) গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া বেচাকেনায় বহু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. পশু হতে উৎপাদিত কোন দ্রব্যে খাদ্যের সব কয়টি উপাদান বিদ্যমান থাকে?  
ক. দুধ  
খ. মাংস  
গ. হাড়  
ঘ. চর্বি
২. পশুর হাড় গুঁড়া করে তৈরি করা হয়—  
i. উৎকৃষ্ট সার  
ii. পশু পাখির খাদ্য  
iii. বায়োগ্যাস

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |



নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩- ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

তৌহিদের বাবা দীর্ঘদিন ধরে গৃহপালিত পশুর মাংসের ব্যবসা করেন। তিনি বাজার থেকে গরু, ছাগল ও ভেড়া ক্রয় ও জবাই করে তার দোকানে বিক্রয় করেন। জবাইয়ের পর তিনি মাংস সংগ্রহ করে বিক্রয়ে যত্নবান হলেও পশুর চামড়া, হাড়, শিং বা ভেড়ার পশম সংগ্রহে তেমন গুরুত্ব দেন না।

৩. গৃহপালিত পশুর মাংস বিক্রয় করে তৌহিদের বাবা—

- ক. প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন
- খ. প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন করছেন
- গ. নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন
- ঘ. বায়োগ্যাস তৈরির উপাদান সরবরাহ করছেন।

৪. গবাদি পশুর হাড় ও শিং দিয়ে—

- i. উৎকৃষ্ট সার ও বায়োগ্যাস তৈরি করা যায়
- ii. অলংকার ও চিবুনি তৈরি করা হয়
- iii. খেলনা ও পশু পাখির খাদ্য তৈরি করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. ii          |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. বাংলাদেশে খাদ্য হিসাবে গৃহপালিত পশুর কোন গুচ্ছটি অধিক জনপ্রিয় ?

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ক. ছাগল ও ভেড়া | খ. গরু ও ছাগল  |
| গ. গরু ও মহিষ   | ঘ. ছাগল ও মহিষ |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

রহিম মিয়া নিজের গরু ও মহিষ দ্বারা হাল চাষ করেন। এছাড়া ফসল সংগ্রহ, মাড়াই কাজ ও অন্যান্য কাজে গরু ও মহিষ ব্যবহার করেন। গরু ও মহিষের অনেক উপকারিতা দেখে গ্রামের অন্যান্য কৃষকগণ বেশি বেশি গরু ও মহিষ পালনে আগ্রহী হয়। কয়েকজন বেকার যুবক গরু ও মহিষের মত অন্যান্য গৃহপালিত পশু পালন করে তাদের বেকারত্ব দূর করতে সক্ষম হয়।

- ক. দেশের আবাদযোগ্য জমির কতভাগ গরু ও মহিষ দ্বারা চাষ করা হয় ?
- খ. গরু ও মহিষ ফসল সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয় কেন ?
- গ. গৃহপালিত পশু পালন দ্বারা কীভাবে বেকারত্ব দূর করা যায়? বর্ণনা কর।
- ঘ. রহিম মিয়ার সাফল্য দেখে গ্রামের অন্যান্য কৃষকগণের গরু-মহিষ পালনে আগ্রহী হওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### গবাদি পশুর খাদ্য

জীবনধারণের জন্য মানুষের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন গৃহপালিত পশুরও তেমনি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। যে খাদ্য গ্রহণ করলে দেহের ক্ষয়পূরণ ও শক্তি উৎপাদিত হয় তাকে খাদ্য বলা হয়।

#### খাদ্যের কাজ

গৃহপালিত পশুকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খাওয়ানো হয়ে থাকে। এসব খাদ্যের কাজ বহুবিধ। দেহে এসব খাদ্যের কাজ প্রধানত—

- (১) দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন।
- (২) দেহের তাপ ও শক্তি উৎপাদন।
- (৩) দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ান।

**খাদ্যের উপাদান :** গবাদি পশুর খাদ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি উপাদানের প্রয়োজন হয়। যথা—

- (১) আমিষ
- (২) শর্করা
- (৩) স্নেহ পদার্থ
- (৪) খনিজ পদার্থ
- (৫) ভিটামিন
- (৬) পানি

**আমিষ :** আমিষ পশুর দেহের নানাবিধ কার্য সাধন করে। দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সহায়তা করে। আমিষ পশুর দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে থাকে। দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ডাল, খৈল প্রভৃতিতে আমিষ উপাদান থাকে। তাই পশুকে দৈনিক আমিষজাতীয় খাদ্য খাওয়ানো দরকার।

**শর্করা :** শর্করা দেহে তাপ উৎপাদন করে কর্মশক্তি যোগায়। পশুর সুখম খাদ্যে শর্করাজাতীয় খাদ্য বেশি দেওয়া হয়। ভুট্টা, গম, গমের ভুশি, চাউলের কুঁড়া ও ঝোলাগুড়ে শর্করা উপাদান থাকে।

**স্নেহ পদার্থ :** স্নেহ পদার্থ শক্তি উৎপাদনকারী উপাদান। এর প্রধান কাজ দেহে তাপ ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি। স্নেহ পদার্থ চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে দেহে জমা থাকে। পশুর খাদ্যের অভাব হলে বা অতিরিক্ত পরিশ্রম হলে এসব চর্বি দেহে তাপ ও শক্তি যোগান দেয়। স্নেহ পদার্থ ত্বকে মসৃণতা আনে। খৈল ও ডালে স্নেহ পদার্থ থাকে।

**ভিটামিন :** পশুর জন্য সাধারণত ভিটামিন এ. ডি. ই প্রয়োজন। ভিটামিন এ রোগ প্রতিরোধ করে। সবুজ ঘাস, গাছের পাতা, ভিটামিন এ-এর প্রধান উৎস। তাই পশুকে প্রচুর কাঁচা সবুজ ঘাস খাওয়াতে হয়। চামড়া, হাড় ও দাঁতের গঠন ও সুস্থতা রক্ষার জন্য ভিটামিন ডি প্রয়োজন।

**খনিজ পদার্থ :** ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, দস্তা প্রভৃতি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান। তাছাড়া ম্যাংগানিজ, লৌহ, কপার ও কোবাল্ট পশুর দেহের জন্য প্রয়োজন। হাড় ও দাঁত গঠনের জন্য খনিজ পদার্থ বিশেষ করে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের প্রয়োজন।

**পানি :** জীবদেহের জন্য পানি অপরিহার্য। খাদ্য পরিপাকের জন্য পানি প্রয়োজন। পানি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। পানির সাহায্যে দেহের দূষিত পদার্থ মলমূত্র ও ঘামের আকারে বেরিয়ে যায়। তাই পশুকে নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়াতে হয়। পশুকে প্রচুর পরিমাণ রসালো কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হয়।

**সুষম খাদ্য :** পশুপালনে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। কোন খাদ্যে পশুর প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানসমূহ সঠিক পরিমাণে থাকলে তাকে সুষম খাদ্য বলে। গৃহপালিত পশুর দেহ গঠন ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। আমাদের দেশের পশুকে সুষম খাদ্য খাওয়ানো হয় না। তাই পশু রোগ ব্যাধিতে ভোগে।

**খড় :** একটি দেশি গরুকে দৈনিক ২-৩ কেজি শুকনা খড় খাওয়াতে হয়। বড় আকারের গরুকে দৈনিক ৩-৪ কেজি শুকনা খড় খাওয়াতে হয়।

**কাঁচা ঘাস :** গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য সবুজ কাঁচা ঘাস। দেশিয় একটি গরুকে দৈনিক ১০-১২ কেজি সবুজ কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হয়। উন্নত জাতের একটি বড় গরুর জন্য দৈনিক ১৩-১৫ কেজি কাঁচা ঘাস প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে কাঁচা ঘাসের অভাব খুব বেশি। সবুজ কাঁচা ঘাস পাওয়া না গেলে পশুকে গাছের সবুজ পাতা, বিভিন্ন ধরনের লতাগুলু, তরিতরকারি ও ফলমূলের উচ্ছিষ্ট অংশ খাওয়ানো যায়। উন্নত জাতের গাভী পালন করে বেশি দুধ পেতে হলে দৈনিক প্রচুর পরিমাণে সবুজ কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হয়। উন্নত জাতের বহু ঘাস আছে যেগুলো চাষ করে কাঁচা ঘাসের অভাব মিটানো যায়। নেপিয়র, পারা, জার্মান, ভুট্টা প্রভৃতি উন্নত জাতের ঘাস। পুকুর পাড়, নদীর তীর, রাস্তার ধার ও বাঁধে ঘাস উৎপাদন করা যায়।

**দানাদার খাদ্য :** দুগ্ধ প্রদানকারী পশুর জন্য দানাদার খাদ্য দরকার। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলো মিশিয়ে দানাদার খাদ্য তৈরি করা যায়। যেমন—

গমের ভুশি	৫.০০ কেজি
চাউলের কুঁড়া	২.০০ কেজি
খেসারি ভাজা	১.৫০ কেজি
তিল বা বাদাম খৈল	১.২০ কেজি
খনিজ মিশ্রণ	০.২০ কেজি
লবণ	০.১০ কেজি
মোট	১০.০০ কেজি

মিশ্রিত দানাদার খাদ্য হতে পশুকে নিম্নলিখিত হারে খাওয়াতে হয়।

বাহুর বয়স অনুপাতে দৈনিক ০.৫০—১.০০ কেজি।

গাভী-দেশি গাভী দৈনিক ১.৫-২.০০ কেজি।

উন্নত গাভী দৈনিক ৩-৪ কেজি।

ষাঁড় ও বলদ দৈনিক ৩-৪ কেজি।

**পানি :** পশুকে প্রচুর বিশুদ্ধ পানি পান করতে দিতে হবে।

## ব্যবহারিক

বিষয় : খাদ্য পরিচিতি ও খাদ্য তৈরি

### উপকরণ

খড়, নেপিয়ার ঘাস বা অন্য কোন ঘাস, গমের ভুশি, চাউলের কুঁড়া, খেসারি ভাঙা, তিলের খৈল বা চিনাবাদামের খৈল, খনিজ মিশ্রণ, লবণ, বোলাগুড়, পানি বা ফেন পরিমাণমত, একটি দা বা বাঁটি, একটি বড় চাড়ি বা ড্রাম।

### কাজের ধাপ

- ১। খাদ্যদ্রব্যগুলোর সাথে পরিচিত হও এবং পশুর জন্য দানাদার খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত কর।
- ২। খাদ্যগুলো পলিথিনের উপর একসাথে মিশাও।
- ৩। দা দিয়ে ৩ কেজি খড় কুচি কুচি করে কাট।
- ৪। চাড়ি বা ড্রামে কাটা খড়, দানাদার মিশ্রণ ও ভাতের মাড় একসাথে মিশাও।
- ৫। ৩০০ গ্রাম বোলাগুড়ও সাথে মিশাও।
- ৬। কাজের ধাপগুলো ব্যবহারিক খাতায় লেখ।
- ৭। চাড়ি বা ড্রামে মিশ্রিত খাদ্যগুলো একটি গাভীকে খেতে দাও।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য কোনটি?  
ক. কাঁচা ঘাস  
খ. খড়  
গ. পানি  
ঘ. গমের ভুশি
২. কোনগুলো উন্নত জাতের ঘাস?  
ক. নেপিয়ার ও দূর্বা  
খ. ভূট্টা ও ইপিল-ইপিল  
গ. পারা ও শ্যামা  
ঘ. জার্মান ও ভূট্টা
৩. গৃহপালিত পশুকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খাওয়ানো হয়—  
i. দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য  
ii. প্রচুর জৈব সারের উপাদান সৃষ্টি করতে  
iii. পশুর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪-৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মিহির চৌধুরীর ২টি উন্নত জাতের গাভী রয়েছে। বর্ষাকালে ঘর ভিজা ও স্যাঁতস্যাঁতে থাকায় তিনি গাভীকে শুকনা খড় ও অল্প পরিমাণে পানি খাওয়ান যাতে রাতে গাভী মলমূত্র ত্যাগ করে ঘর নষ্ট না করে। তিনি লক্ষ করেন দুধের পরিমাণ কমে গিয়েছে। পরামর্শের জন্য গেলে পশু ডাক্তার গাভী দুটির কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ও সুস্বাদু খাবার খাওয়াতে বললেন।

৪. গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য কোনটি?

ক. শুকনা খড়

খ. গমের ভূশি

গ. তিলের খেল

ঘ. কাঁচা ঘাস

৫. মিহির চৌধুরীর ২টি গাভীর জন্য দৈনিক কত কেজি কাঁচা ঘাস প্রয়োজন?

ক. ২ - ১০

খ. ১০ - ১২

গ. ১৩ - ১৫

ঘ. ২৬ - ৩০

৬. মিহির চৌধুরীর গাভীর কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূর করতে অধিকতর কার্যকর কোনটি?

ক. কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাবার

খ. দানাদার খাবার ও পানি

গ. পানি ও কাঁচা ঘাস

ঘ. দানাদার খাবার ও শুকনা খড়

### সৃজনশীল প্রশ্ন

সোলায়মান সাহেব একটি দুগ্ধ খামারের সফল মালিক। একটি লাভজনক দুগ্ধ খামারের জন্য অপরিহার্য করণীয়গুলো তিনি বেশ ভাল জানেন। তিনি তার খামারের গাভীগুলোর সুস্বাদু খাদ্যের ব্যাপারেও খুবই সচেতন। তিনি সব সময় গবাদি পশুর খাদ্যের উপাদানগুলোর ওপরও লক্ষ্য রাখেন। দুগ্ধ উৎপাদনে তার খামারের সাফল্য অন্যান্যদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে।

ক. সুস্বাদু খাদ্য কাকে বলে?

খ. সোলায়মান সাহেব কেন সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি সচেতন ছিলেন তার একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. দুগ্ধ খামারে সফলতা পেতে সোলায়মান সাহেব কোন ধরনের খাবার গবাদি পশুকে বেশি প্রদান করবেন তা বর্ণনা কর।

ঘ. দেশের আমিষের চাহিদা পূরণ করতে সোলায়মান সাহেবের খামারের মত দুগ্ধ খামারগুলির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# গবাদি পশুর রোগ ও করণীয়

আমাদের দেশে প্রতি বছর অনেক গবাদি পশু বিভিন্ন রোগে মারা যায়। পশু সম্পদের উন্নয়ন করতে হলে রোগ ব্যাধির হাত থেকে এদেরকে বাঁচাতে হবে।

## রোগের পরিচিতি

গবাদি পশুর বহু ধরনের রোগ হয়ে থাকে। এদেরকে আমরা নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন—

১) সংক্রামক রোগ, ২) অপুষ্টিজনিত রোগ ৩) পরজীবী ঘটিত রোগ।

**সংক্রামক রোগ :** গবাদি পশুর বিভিন্ন রোগের মধ্যে সংক্রামক রোগ বেশি মারাত্মক হয়। সংক্রামক রোগেই পশু বেশি মারা যায়। রোগাক্রান্ত পশু হতে সুস্থ পশুতে রোগজীবাণু সংক্রমিত হয়ে যে সব রোগ হয় সেগুলোকে সংক্রামক রোগ বলে। গবাদি পশুর বহু ধরনের সংক্রামক রোগ হয়ে থাকে। এর মধ্যে খুরা রোগ, জলাতংক, গো-বসন্ত, আমাশয়, বাদলা, তড়কা, গলাফুলা ও ওলান ফুলা প্রধান।

**অপুষ্টিজনিত রোগ :** পুষ্টির অভাবে গবাদি পশুতে যে রোগ হয়ে থাকে তাকে অপুষ্টিজনিত রোগ বলে।

**পরজীবীঘটিত রোগ :** বিভিন্ন প্রকার পরজীবী দ্বারা পরজীবীঘটিত রোগ হয়ে থাকে।

## স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পালন

গবাদিপশু থেকে ভাল উৎপাদন পেতে হলে এদের স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পালন করতে হয়। গোয়ালঘর নিয়মিত পরিষ্কার ও শুকনা রাখতে হয়। গোয়ালঘরের মেঝে ভিজা থাকলে কৃমি রোগের আক্রমণ হয়। পশু ভালভাবে বিশ্রাম নিতে পারে না। পশুকে পরিষ্কার খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হয়। কারণ পচা বাসি খাবার ও দূষিত পানির মাধ্যমে পশুর শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে। পচা বাসি খাবারে বিষক্রিয়াও হতে পারে। খাদ্য ও পানির পাত্র এবং পশুর ব্যবহার্য জিনিসপত্র সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়।

## রোগ হলে করণীয়

গবাদি পশুর রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অসুস্থ পশুটিকে সুস্থগুলো থেকে পৃথক করতে হবে। তারপর ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। পশুকে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হয়। রোগ হয়ে গেলে অনেক সময় পশুকে বাঁচান যায় না। তাই রোগ যাতে না হয় সেজন্য রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সুস্থ অবস্থায় পশুকে নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা প্রদান রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। টিকা দিলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন রোগের টিকা উৎপাদন করে সারাদেশে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

## মৃত গবাদি পশুর সৎকার

আমাদের দেশে কোন গবাদি পশু মারা গেলে আমরা তা মাঠে, বন জঙ্গলে অথবা নদীতে ফেলে দেই। এটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ মৃত পশু যেখানে সেখানে ফেললে পরিবেশ দূষিত হয়। রোগজীবাণু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যান্য সুস্থ পশু রোগে আক্রান্ত হয়। রোগ মহামারী আকার ধারণ করে। এর ফলে রোগ দমন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই মৃত পশু যেখানে সেখানে না ফেলে মাটিতে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হয়।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. গবাদি পশুর বিভিন্ন রোগের মধ্যে কোন ধরনের রোগ সবচেয়ে মারাত্মক?
 

ক. সংক্রামক রোগ	খ. পরজীবী রোগ
গ. কৃমি রোগ	ঘ. অপুষ্টিজনিত রোগ
২. গোয়ালঘর ভিজা থাকলে পশুর কোন রোগ হয়?
 

ক. জলাতংক	খ. বসন্ত রোগ
গ. কৃমি রোগ	ঘ. অপুষ্টি রোগ
৩. বাসি খাবারে পশুর কী অসুবিধা হয়?
  - i. বিসক্রিয়া হয়
  - ii. শরীরে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে
  - iii. পশুর গলাফুলা রোগ হয়

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ – ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সেলিনা আক্তারের ছোট আকারের একটি গরুর খামার আছে। কিন্তু সচেতনতার অভাবে প্রায়ই তার গোয়ালঘরের মেঝে ভিজা থাকে। প্রায়শই তার খামারের গরুগুলো রোগে আক্রান্ত হয়। এতে তিনি ভীষণ চিন্তিত।

৪. গোয়ালঘরের মেঝে কেমন থাকতে হয়?
 

ক. ঠাণ্ডা ও কিষ্কিত সঁাতসঁাতে	খ. পরিষ্কার ও সঁাতসঁাতে
গ. শুকনা ও পরিষ্কার	ঘ. পরিষ্কার ও মসৃণ
৫. সেলিনা আক্তারের খামারের গরুগুলি কোন রোগে আক্রান্ত?
 

ক. সংক্রামক রোগে	খ. বাদলা রোগে
গ. খুরা রোগে	ঘ. পরজীবী ঘটিত রোগে
৬. রোগাক্রান্ত গরুগুলো সুস্থ করতে সেলিনা আক্তার কী পদক্ষেপ নিতে পারেন?
 

ক. রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়া	খ. কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো
গ. দুত বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	ঘ. রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া

**সৃজনশীল প্রশ্ন**

গত বছর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পলাশতলী গ্রামে গরুর তড়কা রোগের ব্যাপক আক্রমণ দেখা দেয় এবং এতে অনেক গবাদি পশু মারা যায় গ্রামের লোকজন তাদের মৃত পশুগুলোকে পাশের খালের পাড়ে, মাঠে এবং জঙ্গলে ফেলে রাখে ক্রমান্বয়ে রোগটি পাশের গ্রামগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে বিষয়টি উপজেলা সদরে জানানো হলে সরকারি পশু ডাক্তার জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন

- ক. সংক্রামক রোগ কাকে বলে ?
- খ. তড়কা রোগের একটি উপসর্গ বর্ণনা কর
- গ. গবাদি পশুর রোগ হলে করণীয় কী কী ?
- ঘ. কিভাবে মৃত পশুর সংস্কার করা উচিত ছিল ব্যাখ্যা কর





জীবসেবা পরম ধর্ম

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন - দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে  
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোল  
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য